ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ৪ সংখ্যা ।। ১০ আশ্বিন ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

অযোধ্যার রায় নিয়ে মিডিয়ার একাংশের অপপ্রচার

গুপ্তপুরুষ ।। ২৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ ঐতিহাসিক রাম জন্মভূমি মামলার রায় ঘোষণা করবে। কিন্তু আদালতের রায় ঘোষণার আগেই যেভাবে মিডিয়া সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তা নিন্দনীয়। প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় কাল্পনিক গপ্পো লেখা হচ্ছে যে আদালতের রায় পছন্দ না হলে 'হিন্দু মৌলবাদীরা' (?) উত্তর ভারতে দাঙ্গা লাগাবে। বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র লিখেছে শুক্রবার রায় ঘোষণার দিন বেছে নেওয়ার অর্থ আদালত অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি বিতর্কে হিন্দুদের দাবি নাকচ করেছে। কারণ, সপ্তাহের ওই বিশেষ দিনটি মুসলমানদের কাছে পবিত্র। চমৎকার যুক্তি। মিডিয়ার তিল-কে তাল করার এমন নমুনা আরও অনেক আছে।

মিডিয়ার ধারাবাহিক অপপ্রচারের সুযোগ নিয়ে রায় ঘোষণার এক সপ্তাহ আগেই উত্তরপ্রদেশ সরকার অযোধ্যায় বহিরাগত তীর্থযাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। হিন্দুর পবিত্র অযোধ্যা, মথুরা, এলাহাবাদ সহ উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ তীর্থস্থানের ধর্মশালা, হোটেল থেকে তীর্থযাত্রীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে। (এরপর ৪ পাতায়)

নিরপেক্ষ থাকুন— মায়াবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অযোধ্যায় রামমন্দির ইস্যুকে কেন্দ্র করে নিরপেক্ষ অবস্থান নিল উত্তরপ্রদেশের শাসকদল মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি। বি এস পি নেত্রী তথা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী পার্টির নেতা-কর্মীদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়ে বলেছেন, তাঁরা যেন অযোধ্যা মামলায় অংশগ্রহণকারী দু'তরফের কাছ থেকেই সমদূরত্ব বজায় রাখেন। মায়াবতী ঘনিষ্ঠ এক সিনিয়র পার্টি-নেতার ব্যাখ্যা— ''আমরা অযোধ্যা ইস্যুতে কোনও এক পক্ষকে সমর্থন করছি— এই জিনিসটা রাজ্যের জনগণকে দেখাতে চাইছি না। মায়াবতী

যে নির্দেশ তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের কাছে পাঠিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে তাঁরা যেন কোনও এক পক্ষকে সমর্থন (এরপর ৪ পাতায়)

দেগঙ্গায় দুর্গাপুজো বন্ধ না বয়কট ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দেগঙ্গা ব্লকে দেবীর বোধন হবে কিনা তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কেননা গত ১৯ সেপ্টেম্বর রবিবার নিরাপত্তার দাবীতে স্থানীয় থানায় দরবার করতে গিয়েছিলেন দেগঙ্গা-বিশ্বনাথপুর সহ অন্যান্য গ্রামের পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। তাঁদেরকে সদর্থক আশ্বাস দিতে পারেননি দেগঙ্গা থানার পুলিশকর্তারা। এতে এলাকায় যেমন পুজো নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তেমনই এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভুগছেন ঘর-বাড়ি লুট হওয়া হিন্দু গৃহস্থরা। যেভাবে পুলিশকে পিটিয়ে ওসি-কে আহত করে র‍্যাফ্‌ ও সেনার উপস্থিতিতে ধর্মোন্মাদ মুসলমান জেহাদিরা একের পর এক গ্রাম লুট করেছে, নাম ধরে ধরে মা-বোনেদের অশ্রাব্য গালিগালাজ ও শ্লীলতাহানি করেছে তারপর আর কেউই কম-বয়সী মেয়েদেরকে ঘরে রাখতে সাহস পাননি।

দেগঙ্গা ব্লকের পঞ্জীকৃত ২৪টি ক্লাব দুর্গাপুজো করে থাকে। দেগঙ্গা বাজারে কিন্তু হিন্দুদেরই বসবাস। তবে মসজিদ ও তৎ-সংলগ্ন কবরস্থান রয়েছে, পুজোর জায়গাটিও লাগোয়া। পুজোর প্যান্ডেল বাঁধার বাঁশ এখনও যথাবৎ পড়ে রয়েছে। পুলিশও আশ্বস্ত করেনি। উল্টে তিন দিন সময় চেয়েছে। ভাবনা চিন্তা হবে হিন্দুদের শারদীয়া পুজোতে হিন্দুস্থানে এই পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধবাবুর পুলিশবিভাগ তাদেরকে নিরাপত্তা দেবে কিনা!

বিপত্তি ঘটল থানা থেকে ২২টি ক্লাবের প্রতিনিধিরা বের হতেই। বেলিয়াঘাটা এবং দেগঙ্গা মোড়ে সহস্রাধিক মারমুখী মুসলমানের হুমকি। কবরস্থানকে বর্জিত করতে না দিলে দেখে নেওয়া হবে। পরে র‍্যাফ্‌ হিন্দুদের জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়। যাইহোক এই র‍্যাফের কীর্তিকলাপ এবং সক্রিয়তা যা গত ৬।৭।৮ সেপ্টেম্বর

বাঁশ ফেলা হলেও প্যান্ডেল হয়নি দেগঙ্গায়।

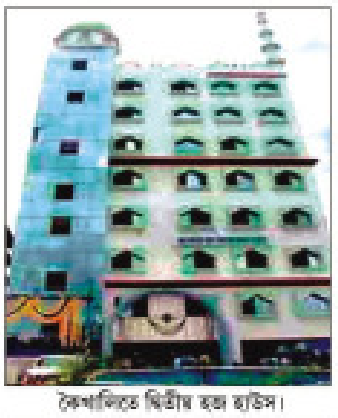

কৈখালিতে দ্বিতীয় হজ হাউস।

দেগঙ্গা ও সংলগ্ন ৮-১০টি গ্রামের মানুষ দেখেছে তাতে ভরসা পাওয়ার মতো কিছু নেই। রাজনৈতিক দলগুলো মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে শান্তি মিছিল করেই ইতিকর্তব্য সমাপ্ত করেছে। হিন্দুদের খোঁজ-খবর নিতে বা ক্ষতে প্রলেপ দিতে আত্ত ইসলামী বিপদে সাহস যোগাতে কাউকে দেখা যায়নি। ব্যতিক্রমী বিজেপি দলের নেতা-নেত্রীরা। তবে তাদেরকে সেজন্য নানা বদনাম শুনতে হয়েছে। একশ্রেণীর সংবাদ মাধ্যমের টার্গেট হয়েছেন তাঁরা। এদিকে রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধী-দলের মধ্যে গত কয়েকবছর যাবৎ প্রতিযোগিতা চলছে কারা মুসলমানদের কত বড় সেবক—তার।

একাধিক হজ-হাউস, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ক্যাম্পাস উদ্বোধনে যতটা উৎসাহ তার ছিটেফোঁটাও ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের জন্য দেখা যায়নি। তাঁদের কাপড়ের মেলার উদ্বোধনে বুদ্ধবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে বুটিক ব্যবসায়ী গার্গী রায় জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের কোনও ঋণ তিনি পাননি। বুদ্ধবাবু ভ্রূ-কুঁচকে ন্যাকা সেজেছেন। অথচ তিন দিনের একতরফা দাঙ্গায় হিন্দুদের কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। এখনও হিন্দুরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন বলে খবর। যে সকল ক্লাবের প্রতিনিধি সেদিন থানায় গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে দেগঙ্গা চট্টল সমিতি, বিদ্যাসাগর ক্লাব, বিশ্বনাথপুর উন্নয়ন সমিতি, দেগঙ্গা যুবক সঙ্ঘ প্রভৃতি ক্লাবের নাম রয়েছে।

কংগ্রেস স্থিতাবস্থাকেন্দ্রিক দল —হরিশ খারে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কংগ্রেস প্রকৃতিগত ভাবেই স্থিতাবস্থা কেন্দ্রিক দল এবং কোনও আদর্শের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নেই। নির্বাচনে জেতাই কংগ্রেসের একমাত্র দায়বদ্ধতা। না, এই বক্তব্য কোনও বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীর নয়। এই বক্তব্য খোদ প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া অ্যাডভাইসার হরিশ খারের। গত ১৯ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এক পুস্তক উন্মোচনের অনুষ্ঠানে শ্রী খারে এই মন্তব্য করেন। প্রাক্তন সাংবাদিক শ্রী খারে এই প্রথম প্রকাশ্যে এমন একটি দলের বিষয়ে এই মন্তব্য করলেন যারা এখন কেন্দ্রে শাসকজোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তিনি নিজে সেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মী।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক সুধা রাই লিখিত 'ডেভলপমেন্টাল স্টেট অ্যান্ড দি দলিত কোশ্চেন ইন্‌ মধ্যপ্রদেশ ঃ কংগ্রেস রেসপন্স' গ্রন্থটির উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করে শ্রী খারে এই মন্তব্য করেন। যদিও পরে শ্রী খারে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া অ্যাডভাইসার হিসেবে নয়, এই মন্তব্য তিনি করেছেন 'একজন ছাত্র ও কংগ্রেস দলের গবেষক হিসাবে।' সাম্প্রতিক কংগ্রেস সম্পর্কে নয়, তার এই মন্তব্য—১৯৯৩-২০০৩ সালে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস দলের অবস্থার নিরীখে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ও মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং অবশ্য শ্রী খারের এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত নন বলে জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী মহাষষ্ঠী ১৩ অক্টোবর, ২০১০ থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ২২ অক্টোবর, ২০১০ পর্যন্ত স্বস্তিকা দপ্তর বন্ধ থাকবে। ২৩ অক্টোবর ২০১০, স্বস্তিকা দপ্তর আবার খুলবে।

আগামী ৪ অক্টোবর ২০১০ স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হবে এবং ১১ অক্টোবর ২০১০ সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

আগামী ১৮ অক্টোবর ২০১০ ও ২৫ অক্টোবর ২০১০ স্বস্তিকার কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। আবার ১ নভেম্বর ২০১০ থেকে স্বস্তিকা যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা

ভারতকে আক্রমণের নয়া কৌশল

শ্রীলঙ্কায় ঘাঁটি গেড়েছে লস্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কাশ্মীরের বদলা নিতে সদ্য আসন্ন 'কমনওয়েলথ গেমস'-কেই টার্গেট করলো সন্ত্রাসবাদীরা। একদিকে মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর নয়াদিল্লীকে জানাচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে শ্রীলঙ্কার মাটিকে ব্যবহার করছে লস্কর। অন্যদিকে গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লীতে কমনওয়েলথ গেমস শুরুর মাত্র সপ্তাহ দু'য়েক আগে সংঘটিত জোড়া নাশকতার ঘটনার অব্যবহিত পরেই দায় ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। কূটনৈতিক মহল মনে করছে, উপমহাদেশীয় নিরাপত্তা নিয়ে কমনওয়েলথ গেমস-এ অংশগ্রহণকারী দেশগুলো যখন চিন্তিত, তখন এখানে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালিয়ে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক করে তুলে কাশ্মীরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে উদগ্রীব বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি এই মুহূর্তে এমনিতেই খুব জটিল। সরকারও কিছুটা অস্বস্তিতে রয়েছে এনিয়ে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা চাইছে, এই চাপের মুহূর্তে ভারত সরকারের ওপর আরও চাপ বাড়িয়ে কাশ্মীর থেকে এ এফ এস পি এ প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করতে। সবমিলিয়ে কাশ্মীর-ইস্যুকে বিশ্বের সামনে এনে ভারত থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করেছে সন্ত্রাসবাদীরা।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মাটিকে একাজে এতদিন ব্যবহার করার পর আপাতত শ্রীলঙ্কার ভূমিকে ভারত-বিরোধী কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, জার্মান বেকারী বিস্ফোরণের

মির্জা হিমায়াত বেগ

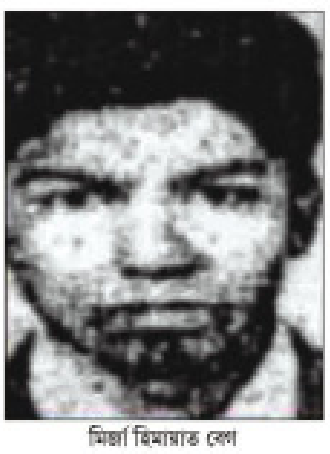

ঘটনায় মূল পাণ্ডা সদ্য ধৃত মির্জা হিমায়াত বেগ গা-ঢাকা দেবার জন্য সম্প্রতি যোগাযোগ করেছিল শ্রীলঙ্কায়, লস্কর-এ-তৈবার ক্যাডারদের সঙ্গে। মার্কিন গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, লস্করের দু'শো জন ক্যাডার ইতিমধ্যেই রাজধানী কলম্বো সহ দ্বীপরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং শ্রীলঙ্কাকে 'স্টেজিং গ্রাউন্ড' হিসেবে ব্যবহার করে তারা এদেশে ঢোকার ছক কষছে।

ওয়াশিংটন জানিয়েছে, তারা এব্যাপারে কলম্বোকে সতর্ক করলে কলম্বো প্রত্যুত্তরে বলেছে তাদের ভূমিকে লস্করের ব্যবহার করার কোনও প্রশ্নই নেই। নয়াদিল্লী আশঙ্কা করছে, এল টি টি ই সুপ্রিমো প্রভাকরণ নিহত হলেও তাদের কিছু ক্যাডার এখনও আত্মগোপন করে রয়েছে। এদের সঙ্গে যদি কোনওভাবে লস্করের যোগাযোগ থেকে থাকে তবে তা ভারতের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। কারণ শ্রীলঙ্কার মাটিতে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ চললেও শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছে তা অজ্ঞাত থেকে যাবার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। গোয়েন্দাসূত্র বলছে, মির্জা বেগ শ্রীলঙ্কার মাটিতেই প্রশিক্ষিত হয়েছিল। ২০০৮-এ সে শ্রীলঙ্কায় যায় এবং লস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করে। গোয়েন্দারা এখন খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন যে, মির্জা শ্রীলঙ্কার কোন কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ করেছে এবং কাদের কাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ও সেই ব্যক্তিদের ও স্থানগুলোর সঙ্গে লস্করের সংযোগ কতটা? একইসঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শ্রীলঙ্কায় থাকা দু'শো জন লস্কর জঙ্গি আসলে (এরপর ৪ পাতায়)

জনগণ আমরা কিন্তু চুপ থাকবো

নটরাজ ভারতী ঃ আমরা চুপ থাকবো। আমরা কোনও কথা বলবো না। আমরা, যারা কলকাতার বাজারে নিয়মিত বুদ্ধি বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করি। আমরা, যারা, নিজেদের বুদ্ধির প্রমাণ দিতে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি পরে সন্ধ্যাবেলায় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে আড্ডা দিই। আমরা যারা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নিয়মিত বুদ্ধি বিতরণ করি। প্যালেস্তাইনের মানুষের দুঃখে বুক চাপড়ে কাঁদি ধর্মতলার মোড়ে। রিজয়ানুর নামের এক মুসলিম যুবকের আত্মহত্যার জন্য মোমবাতি নিয়ে মিছিল করি লেনিন সরণিতে। মাওবাদীদের সমর্থনে হাজির হই হল ভরাতে। সেই আমরা কিন্তু এখন কিছু বলবো না। বিশ্বজুড়ে ইসলাম যে ভয়ঙ্কর তা জানবো-পড়বো-দেখবো, কিন্তু কিছু বলবো না। আমরা বলবো ইসলাম মহান। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য আমরা যারা আন্দোলন করি এখন তারাও এসপ্ল্যানেডের মেট্রোর সামনে গলা ফুলিয়ে বলবো সব ঠিক আছে। কোথাও কিছু গণ্ডগোল নেই।

আয়েশা নামের ১৮ বছরের এক তরুণী। তালিবানি স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত। একসময় সিদ্ধান্ত নেয়— বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। স্বামীর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে হবে। সেইমতো একদিন স্বামীর ঘর ছেড়ে পালায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ধরা পড়ে যায় স্বামীর হাতেই। সেই স্বামী তাকে নিয়ে যায় ইসলাম ধর্মের রক্ষকদের কাছে। শুরু হয় তার বিচার। ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী হাত পা বেঁধে তার নাক ও কান কেটে দেওয়া হয়। তার সেই নাক কান কাটা বীভৎস ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বর্বরতার চূড়ান্ত নিদর্শন। আমরা দেখছি। কিন্তু আমরা চুপ থাকবো। আমরা দুহাত তুলে বলবো ইসলাম মহান। তার শাসন পদ্ধতি মহান।

ইরান দেশের চেতাল্লিশ বছরের সুন্দরী আসতিয়ানি। দুই সন্তানের মা। স্বামী খুন হওয়ার পর দুই সন্তানকে নিয়ে কোনক্রমে দিন চালাতেন। অনেকের কুনজর ছিল তার উপর। শেষ পর্যন্ত অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। ব্যস আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে বিচার। ইসলামী শাসন অনুসারে। সর্বসমক্ষে ৯৯ ঘা চাবুক। সেখানেই শেষ নয়। এবার শাস্তি আরও ভয়ঙ্কর। কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ইট পাটকেল ছুঁড়ে হত্যা। বিশ্বের বহুদেশ, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাই এখনও তাকে মেরে ফেলা হয়নি। সকালের ব্রেকফাস্টে টোস্টে কামড় দিতে দিতে আমরা সব শুনছি— সব জানছি, কিন্তু এই বর্বরতার বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলবো না। কারণ এটা মহান ইসলামের বিধান। বিশ্বের মানুষ অথবা রাষ্ট্রসঙ্ঘ যা বলছে বলুক আমরা বলবো ইসলাম মহান। এই ভয়ঙ্কর নির্মমতা ও বর্বরতা নিয়ে আমরা মুখ খুলবো না। আমরা তার চেয়ে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে টিভিতে প্রচার করবো।

পনেরই আগস্ট আমরা যখন স্বাধীনতার আনন্দে বিভোর, তখন আফগানিস্তানের কুন্দুস প্রদেশে দাশত-ই আরচির খোলা বাজারে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ঢিলে ঢিলে ঢিল ছুঁড়ে মারা হচ্ছে এক তরতাজা যুবক ও এক সুন্দরী যুবতীকে। অপরাধ প্রেম। বাড়িতে তাদের প্রেম মেনে নেয়নি। তাই ভালবাসার টানে বাড়ি ছেড়েছিল তারা। ইচ্ছে ছিল গোপনে লুকিয়ে বিয়ে করা। কিন্তু বাঁচতে পারেনি। মাঝ পথে ধরা পড়ে যায় মৌলবাদীদের হাতে। তারা তুলে দেয় তালিবান নেতাদের হাতে। প্রেম করার অপরাধের বিচার হয় শরিয়ত অনুসারে। পাথর ছুঁড়ে ঢিলে ঢিলে মারা হয় ওই প্রেমিক-প্রেমিকাকে। শরিয়তে এই শাস্তির নাম 'রোজুম'। এটি সম্পূর্ণভাবে ইসলাম অনুমোদিত। কিন্তু আমরা এর বিরুদ্ধে মুখ খুলবো না। আমরা বলবো ইসলাম প্রেমের ধর্ম। আমরা বলবো শরিয়তের তুলনা নাই। কি দরকার ছিল প্রেমের টানে ওদের বাড়ি ছাড়ার। গত একবছরে আফগানিস্তানে এমন নারকীয় বর্বরতার সংখ্যা এক হাজারের বেশি। রিপোর্ট বিশ্ব মানবাধিকার সংগঠনের।

কেরলের কলেজ লেকচারার টি জে জোসেফ। কলেজ পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র করেছিলেন ছাপার ভুলে সেখানে মহম্মদ এর জায়গায় 'ম্যাঙ-মান' হয়েছিল। মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন তাদের শরিয়তের আইন অনুসারে বিচার করে তার হাতই কেটে নেয়। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়া ঘটনা চেপে গেছে। কারণ ইসলাম মহান। হাত কাটার অধিকার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যন্ত ইসলামী গ্রামেও এমন বিচার প্রায়ই হয়। সব খবর বইরে আসে না। বছর দশেক আগের কথা। আমি তখন একটি দৈনিক সংবাদপত্রে কাজ করি। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে গেলাম। ঘটনা হল মেহের বিবি আর তার স্বামী ছোট কুঁড়ে ঘরে থাকতো। স্বামী ভিখারি। মেহের বিবি এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে। একদিন সন্ধ্যায় যখন মেহের বিবির স্বামী ভিক্ষা করে ফেরেনি তখন তার ভাইয়ের ছেলে আসে। গ্রামের ছেলেদের সন্দেহ হয় যে মেহের বিবির সঙ্গে কাকো অবৈধ সম্পর্ক আছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর থেকে দুজনকে বের করা হয়। পিসি-ভাইপোকে উলঙ্গ করে বাঁধা হয় ইলেকট্রিকের খুঁটিতে। কেটে দেওয়া হয় চুল। ওই গ্রামের মসজিদ থেকে শাস্তি ঘোষণা করা হয়। গ্রামের যুবক ছেলেরা একের পর এক ধর্ষণ করবে মেহের বিবিকে। আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করি তখন তিনি বলেন, রাত আটটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত একের পর এক ধর্ষণ করেছে গ্রামের লোকেরা। শুধু তাই নয়, বাবা-ছেলে-নাতু এক সঙ্গে ধর্ষণ করেছে। ওই গ্রাম থেকে ফিরে বড় করে স্টোরি করে পাঠিয়েছিলাম। ছোট করে বেরিয়েছিল ভিতরের পাতায়।

অন্য একটি গ্রামে মুসলিম বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এক হিন্দু চোর। বিচারের জন্য ডাকা হয় ওই গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবকে। বিচার হলো, কাঠের উপর রেখে কাঁধ থেকে হাত দুটি কুপিয়ে কাটা হয়। সেখানেই মারা যায় ওই চোর। সে সংবাদও করেছিলাম। সে মামলা এখনও চলছে। পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলের একটি আলালতে।

আমরা কিন্তু চুপ থাকবো। রিজয়ানুর আত্মহত্যা করেছে জেনেও তার জন্য আমরা বুক চাপড়ে কাঁদবো। মাওবাদীরা নিরীহ মানুষ, ছাত্রদের হত্যা করছে জেনেও ওদের পাশে দাঁড়াবো। কিন্তু আয়েষার জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলবো না। আসতিয়ানের জন্য কোনও মোমবাতি জ্বালাবো না। শুধুমাত্র প্রেম করার অপরাধে যদি ঢিল ছুঁড়ে বা গুলি করে মারা হয় তবুও আমরা নীরব থাকবো। কারণ আমরা জানি ইসলাম মহান এবং আল্লা দয়ালু। সুতরাং এসব দেখেও আমরা চুপ থাকবো। জনগণ আমরা কোনও কথা বলবো না।

এই সময়

ভারতে শিশুমৃত্যু

শিশুমৃত্যুতে প্রথম স্থান অধিকার করার দুর্ভাগ্য অর্জন করে বিশ্বের দরবারে নতমস্তক হলো ভারত। ইউনিসেফের সমীক্ষা বলছে, শুধু গত বছরেই অর্থাৎ ২০০৯ সালে প্রায় ১৭.২৬ লক্ষ পাঁচ বছর বা তার কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর ফলে মর্টালিটি রেট বা মৃত্যুহার (প্রতি হাজার শিশুর জন্মের নিরীখে) ৬৬ শতাংশে পৌঁছে যায়। তবে এই পরিসংখ্যান একদিনেই 'সৃষ্টি' হয়নি। ১৯৯০ সালে এর অবস্থা ছিল আরও করুণ। সেবছর মৃত্যু হয় প্রায় ৩১ লক্ষ শিশুর। মর্টালিটি রেট ভাবতীয় বিস্ময়ের পাহাড় ঠেলে ১১৮ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল তখন। অনাহার, অপুষ্টি আর ডায়েরিয়া, নিউমোনিয়ার মতো রোগের প্রকোপই শিশুমৃত্যুর মূল কারণ। শিশুমৃত্যুতে ভারতের ধারে-কাছে আর কেউ নেই। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নাইজিরিয়া।

ক্যান্সারে নিমপাতা

ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য সুখবর। কারণ এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে রুগিদের আর নির্ভর করতে হবে না সার্জারি, কেমো বা রেডিওথেরাপির মতো চিকিৎসা পদ্ধতির উপর। খুব শীঘ্রই বাজারে আসতে চলেছে এই রোগের স্বদেশী ঔষধ।

সম্প্রতি, এমনটাই দাবি করেছেন কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের (সি এন সি আই) গবেষক-মণ্ডলী। তাঁদের মতে, 'ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের বিরুদ্ধে এবার কেমোথেরাপি বা সার্জারি নয়, ব্যবহার করা হবে নিমপাতা। নিমপাতার রসে এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন থাকে যা দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা (ইমিউনো সিস্টেম)-কে উদ্দীপিত করে ক্যান্সার রোগে সহায়ক। প্রায় ২০০১ সাল থেকেই ক্যান্সারকে ঘিরে চলছিল সি এন সি আইয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 'কেমোথেরাপি নয়, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে এবার মোক্ষম অস্ত্র হবে নিমের গ্লাইকোপ্রোটিন'— জানালেন সি এন সি আইয়ের বিজ্ঞানী আর এন বড়াল।

তর সইছে না

বিধানসভা ভোট যতই এগোচ্ছে, মুসলিম-তোষণে ততই ধুম পড়ছে এরাজ্যের রাজনৈতিক মহলের। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এই— 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'-র বাজারে তোষণের কৃতিত্বের দাবী নিয়ে রীতিমতো কামড়া-কামড়ি পড়ে গেছে। এই যেমন ধরুন না কেন, মুর্শিদাবাদে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস কিংবা মুর্শিদাবাদকে মুসলিমাবাদ বানানোর ছক। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ মস্তিষ্কপ্রসূত। এর কৃতিত্বের দাবীদার তাই এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু ও অর্থমন্ত্রী প্রণববাবু উভয়েই। কিন্তু একটি প্রকল্পের শিলান্যাস তো দু'জন ব্যক্তি একসঙ্গে করতে পারেন না। তাই ঠিক হয়েছে আগামী ছাব্বিশ তারিখ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী আর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রণব মুখার্জী। এক ফাজিলের ছড়া 'মুসলিম তোষণে বুদ্ধ-প্রণব ভাই-ভাই, মমতা দিদিভাই গেলেন কই?'

বিষাক্ত মধু

আপনি কি আপনার সন্তানকে সুস্থ রাখতে বাজার থেকে কোনও ব্র্যান্ডের মধু কিনে এনে খাওয়াচ্ছেন? যদি খাওয়ান তাহলে জেনে রাখুন 'মধু' তো নয়ই, আপনার সন্তানের মুখে আপনি হয়তো বিষ তুলে দিচ্ছেন। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্যি। কারণ এমনটাই জানিয়েছেন দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্টের (সি এস ই) গবেষকমহল। তাদের দাবি, বাজারে যে সমস্ত বিখ্যাত ব্র্যান্ডের মধু শিশিতে ভরে বিক্রি করা হয় আসলে সেগুলোর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু প্রতিরোধী পদার্থ বা অ্যান্টিবায়োটিক। কখনও কখনও এত বেশি মাত্রায় বা ভুলভাল অ্যান্টিবায়োটিক তাতে দেওয়া হয় যে তা জীবাণুর হাত থেকে মানব শরীরকে বাঁচানোর পাশাপাশি মানুষের শরীরে মিশে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অচল করে দেয়। ফলে পরবর্তীকালে মানবদেহে অনেক রক্তজনিত সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। যার দরুণ আক্রান্ত হয় আমাদের লিভারও।

বন্যার বন্যতা

অসময়ের বন্যা কেমন বীভৎস হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন রাজধানী আর তার প্রতিবেশী উত্তরপ্রদেশের মানুষজন। কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর জলের তলায় চলে যায় নয়া দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ সংযোগকারী ২৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশে। মোরাদাবাদের কাছে ওই জাতীয় সড়ক বন্যার প্রকোপে প্রায় ৬ ফুট গভীর জলের নীচে চলে যায়। কোশী সহ পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ১২ জন মারা গিয়েছেন বন্যায়। কোশী এবং রামগঙ্গা এলাকাকে ইতিমধ্যেই বিপদসঙ্কুল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। গুরুগ্রামের বিভিন্ন সড়ক ও গ্রামে বিপদসীমার ওপর দিয়ে জল বইছে। মোরাদাবাদ সেকশনের সব ট্রেন সাময়িক-ভাবে ক'দিনের জন্য বাতিল করা হয়েছে।

নারীকুলের আয়ুবৃদ্ধি

আয়ুবৃদ্ধি হচ্ছে ভারতবর্ষের নারী-জাতির। তাদের বয়সের গড় বেড়ে হচ্ছে ৭০-এর ওপর। অন্যদিকে পুরুষজাতির আয়ু কমে হচ্ছে ৭০-এর নীচে। এমন-ই কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যটি উঠে এসেছে 'পরিবার কল্যাণ তথ্য-পরিসংখ্যান ২০০৯'-এ। তবে রাজ্য অনুযায়ী এর রকমফেরও আছে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালকে লক্ষ্যমাত্রা ধরে এহেন পরিসংখ্যানটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের সব রাজ্যেই যে মহিলাদের গড় আয়ু ২০২১ সালের মধ্যে ৭০ টপকে যাবে এমন কিন্তু নয়। যেমন— ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ে ৬৯.৫ বছর, মধ্যপ্রদেশে ৬৯.৩ বছর এবং অসমে ৬৮.৮ বছর গড় আয়ু হবে মহিলাদের। আবার ২০২১-এর মধ্যে সবকটি রাজ্যের পুরুষদের আয়ুই যে ৭০-এর নীচে থাকবে এমনও নয়। যেমন— হিমাচলপ্রদেশে ৭২.৪ বছর, গুজরাটে ৭১.৯ বছর, পাঞ্জাবে ৭১.৯ বছর, তামিলনাড়ু ও বিহারে ৭০.৬ বছর হতে চলেছে পুরুষের গড় আয়ু। তবে পরিসংখ্যানটি বলছে, ২০২১ সালের মধ্যে এরাজ্যে মহিলাদের গড় আয়ু হবে ৭৪.৩ শতাংশে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরে সংসদীয় দলের সফর

কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের নেতৃত্বে যে সংসদীয় দল শ্রীনগর ও জম্মু গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রতিনিধিদলের একাংশ সীতারাম ইয়েচুরি, গুরুদাস দাশগুপ্ত প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের নেতৃত্বে উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি, মীর ওয়াইজ ওমর ফারুক, ওয়াসিন মালিক প্রমুখের সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গিয়া শান্তি কিনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও উপত্যকা হইতে বিতাড়িত কাশ্মীরী পণ্ডিতদের সহিত তাহারা সাক্ষাতের কোনও চেষ্টাই করেন নাই। প্রতিনিধিদলের একাংশের এই আচরণে বিজেপি তথা প্রধান বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ এবং তিনি স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সহিত প্রতিনিধি দলের একাংশের সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমের সভাপতিত্বে প্রতিনিধিদের বৈঠকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিষয়টি অস্বীকার করা হইয়াছিল। যাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত;সংসদীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের নহে। বস্তুত যাহারা কাশ্মীরকে 'বিতর্কিত' বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, তাহাদের সহিত আলোচনার কি যুক্তি থাকিতে পারে? ইহাতে বরং কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এই ভাবনার প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে আঙুল তুলিবার একটি অশনি সংকেত লক্ষ্য করা যায়। কাশ্মীর কোনও রাজনৈতিক দল বা তাহাদের প্রতিনিধিদের কোনও রাজনৈতিক এজেন্ডা নহে যে তাহারা কাশ্মীর লইয়া নিজেদের অভিরুচি মতো বালখিল্যতা প্রদর্শন করিবে।

লোকে বলে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসিলেই দেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উগ্রবাদী হইয়া ওঠে। ২০০৪ সাল হইতেই দেশের মানুষ দেখিতেছে কেমন করিয়া আবার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে তো কাশ্মীরের সঙ্গে পাকিস্তানের সমস্ত সীমানায় সামরিক বাহিনী অতন্দ্র প্রহরায় থাকিত। তখন কই কাশ্মীরের অভ্যন্তরে তো অশান্তি ছিল না? ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষের কাছে কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ—যাহার সহিত আবেগময় একাত্মতার সম্পর্ক। তাই কাশ্মীর আপাত-শান্ত হইবার সাথে সাথে তাহারা পুনরায় ভারতের ভূ-স্বর্গে পা রাখিতে শুরু করিয়াছিল। পর্যটন ব্যবসায়ী ও পর্যটক উভয়ের মুখে হাসি ফুটিয়াছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থানের মানুষের। বাজপেয়ী সরকারের পতনের পর মনমোহন সিংয়ের সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রায় সাথে সাথে শুরু হইল আবার সেই পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী অভিযান। মুসলমান মৌলবীতন্ত্রের প্রতি সদা অবনত কংগ্রেস সরকার কারণে-অকারণে তাহাদের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলে। তাহার খেসারত তাহাদেরকেই শুধু নয়—সারা দেশকেই দিতে হইয়াছে। এইবারও তাহারা সেই ভুলটিই করিয়াছে। কাশ্মীর সীমান্ত হইতে ধীরে ধীরে প্রচুর সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করিয়াছে। পরিণামে পাকিস্তান হইতে ভাড়াটে সৈন্য ক্রমাগত হিন্দুস্থানের কাশ্মীরে প্রবেশ করিতেছে এবং কাশ্মীরের তরুণ যুবকদের হিন্দু ও হিন্দুস্থানবিরোধী অর্থাৎ দেশবিরোধী করিয়া তুলিতেছে। কাশ্মীরের অভ্যন্তরে অল্প সংখ্যক সশস্ত্রবাহিনী এই সমস্ত যুবক ও তরুণদের ঘৃণা ও বিদ্রূপের সহজ শিকারে পরিণত হইয়াছে।

কংগ্রেসের প্রোথিত বিষ-বীজ আজ বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়, সেখানেই শুরু হয় বিচ্ছিন্নতাবাদ। আর কংগ্রেস শান্তির বিনিময়ে সত্যকে বিসর্জন দিয়া চলে। কংগ্রেস নিজ দলীয় স্বার্থে এই শান্তির সওদা করে। হিন্দুস্থানের মানুষ কাশ্মীরের প্রশ্নে এই সওদা সহ্য করিবে না। কাশ্মীর ভারতের ভূ-স্বর্গ, পবিত্র ভারতাত্মার সহিত যুক্ত। শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিংসার আশ্রয় লইয়া তাহাদের অসাধু প্রাপ্তিতে কখনও সাহায্য করা চলিবে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য যেমন আলাদা কোনও বিশেষ সুবিধা ভোগ করে না, জম্মু-কাশ্মীরকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। ৩৭০ ধারার মতো কোনও ধারা বলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা জিয়াইয়া রাখা চলিবে না। ভারতের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলয়ই কাশ্মীর সমস্যার একমাত্র সমাধান।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

হিন্দুরাষ্ট্রের তত্ত্বটা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী এরকম একটা যুক্তির বারংবার পুনরুল্লেখ বিরক্তিকর। প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষ ধারণাটার জন্মস্থান পাশ্চাত্যভূমি, আমাদের দেশের মাটির সঙ্গে তার কোনও সঙ্গতি বা সংযোগই নেই। কয়েক শতাব্দী পূর্বে কতিপয় ইউরোপীয় রাজতন্ত্র তাদের রাজত্বের উপর পোপের পুরোহিততান্ত্রিক আধিপত্য রোধে তৎপর হন এবং তার উৎখাত ঘটিয়ে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবেই পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্রবিরোধী হিসাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' (সেকুলার) রাষ্ট্রতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থ দাঁড় করানো হয়েছে— অপরাপর সব ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু এক ধর্মীয় রাষ্ট্র। আমাদের দেশে এ ধরনের বিরোধী বা অসহিষ্ণুতার কোনও অবকাশ অতীতে কোনদিন ছিল না, আজও নেই।

এতদ্ব্যতীত 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটি আমাদের সংবিধানে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কে সুব্বারাও ইতিপূর্বে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কথাটি আমাদের সংবিধানের ওপর চাপানোর চেষ্টা করলে তা নেহাৎ অবান্তর বলে গণ্য হতে পারে।

—শ্রী গুরুজী

মাথা-শিকারীদের দিয়ে আর বাংলার মাটি দখলে রাখা যাবে না

সাধন কুমার পাল

"১৯৭২ দেখেছি। ১৯৭৭ দেখেছি। হাঁটুতে এখনও জোর রয়েছে, তা ফের দেখিয়ে দেব। সাধারণ মানুষের ভোট লুট করতে দেব না। ফাটাফাটি হবে। চোটও হবে! সব বাড়িতে জোয়ান ছেলেরা তৈরি রয়েছে। একটা যদি খুন হয়, তা হলে মাথা গুঁড়িয়ে দেব।— জঙ্গলমহলে সিপিএম-এর ৯০টি শিবির রয়েছে তাতে আপনার (তৃণমূল নেত্রীকে উদ্দেশ্য করে) কী হয়েছে? আপনি এত কান্নাকাটি করছেন কেন? গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ হচ্ছে। তা বরদাস্ত করা হবে না! সুশান্তরা জঙ্গলমহল সামলাবে আর আমরা আমাদের জায়গা!" বক্তা রাজ্যের ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা।

'গুলি খেলে বুকে খাবেন। পিঠে খাবেন না। প্রয়োজনে ঘটি ঘটি রক্ত ঢেলে দেব। পিছুপা হব না।' বক্তা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। অবশ্য এই ঘটি ঘটি রক্তের আহ্বানে খুশি হতে না পেরে ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বললেন, 'কান্তি বলেছে, ঘটি ঘটি রক্ত। আমি বলছি নালা পথ দিয়ে রক্ত বইয়ে দেব। কোনও ভাবে ছাড়া হবে না।' আর পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ বললেন, 'লালগড়ে সিপিএম-এর প্রতিরোধকে যদি দখল বলা হয়, তা হলে এমন অপরাধ বারবার করা হবে। লালগড়ের কায়দায় প্রতিটি গ্রামে গ্রামে সিপিএম সমর্থকদের রুখে দাঁড়াতে হবে। লালগড়ের কায়দায় আগামী দিনে এ রাজ্যে সূর্যোদয় হবে।'

রাজ্যের ক্ষমতাসীন নেতা-মন্ত্রীদের ভাষণ থেকে তুলে ধরা এই নির্বাচিত অংশগুলো যে ফাঁকা আওয়াজ নয় তা এ রাজ্যের চিন্তাশীল মানুষেরা জানেন। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা বলছে দীর্ঘ বাম শাসনে সিপিএম নেতাদের প্রত্যেকটি হাড়হিম করা হুমকির পর ঘটেছে একটি করে শিউরে উঠার মতো ঘটনা। যেমন, সিপিএম নেতা বিনয় কোঙারের চারদিক ঘিরে ফেলে লাইফ হেল করে দেওয়ার হুমকি ও বৃন্দা কারাতের দমদম দাওয়াই দেওয়ার হুমকির পর ঘটে ছিল নন্দীগ্রামের বীভৎস নারকীয় ঘটনা। ১৯৭৮-এ সিপিএম-এর তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তর উদ্বাস্তুদের বল প্রয়োগ করে সরিয়ে দেওয়ার হুমকির পর মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু মানুষদের উপর নেমে এসেছিল নারকীয় অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। তাছাড়া গত ৩১ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ের জনসভায় রাজ্যের নেতামন্ত্রীদের এই রক্ত ঝরানোর হুমকির পর দিনদুয়েক যেতে না যেতেই ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে জঙ্গলমহলের লালগড় সন্নিহিত পিড়াকাঁটায় সংবাদমাধ্যমের লোকেদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে এদের হুমকির প্রতিটি শব্দ আগামীদিনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে চলেছে।

চিন্তাশীল মানুষদের ছেড়ে এবার একটু আমজনতার মাঝে যাওয়া যাক। দেখা যাক তারা সিপিএম-এর এই 'সূর্যোদয়ের আগামবার্তা'গুলো সম্পর্কে কী বলেন? ভয় বিরক্তি ক্লান্তি নিয়ে আমজনতার অনেকেই বলবেন সত্যিই এরাজ্যে বোধহয় আর খুনের রাজনীতি বন্ধ হবে না। গণতন্ত্র, বাক্ স্বাধীনতা, আইনের শাসন এগুলোতো এ রাজ্যে মুখের কথা। কেউ বলবেন, এ রাজ্যে যে হার্মাদতন্ত্র, এলাকা দখলের রাজনীতি কায়েম হয়েছে এই বক্তব্যগুলো তারই প্রমাণ। আবার কেউ বলবেন, গায়ের জোরে এরা ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছে। এই জন্যই হতোদ্যম দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করার জন্য সিপিএম নেতারা গরমাগরম বক্তৃতা ঝাড়ছেন। যার পরিণতি রক্তাক্ত বিধানসভা নির্বাচন। সংখ্যায় কম হলেও এমন কিছু মানুষও পাওয়া যাবে যারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভাষাশৈলী অনুসরণ করে বলবেন— 'কুৎসিৎ', 'বীভৎস' একটি বিরোধী দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গেলে এগুলোই হচ্ছে উপযুক্ত ভাষা।

যারা একটু সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত তারা হয়তো বলবেন আসলে ক্ষমতার নেশা ড্রাগের নেশার চেয়েও সর্বনাশা। এই ভয়ানক নেশা মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে গেলে, দেশ-কাল-পাত্র সম্পর্কে মানুষের অতি সাধারণ স্তরের সংযম ও সাবধানতা জ্ঞান বিলুপ্ত করে দেয়। কারণ এই সভ্য সমাজে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুখে গামছা বেঁধে গভীর জঙ্গলে বা রুদ্ধ দ্বার কক্ষে কোনও তথ্য প্রমাণ না রেখে দলের অনুগত যোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার জন্য যে সমস্ত কথা হওয়ার কথা সেই কথাগুলো সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে মন্ত্রীদের পদে থাকা মানুষগুলো প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বসমক্ষে বলছেন। অথচ এ নিয়ে আম-জনতা থেকে শুরু করে সমাজের কোনও স্তরেই কানাকানি, ফিসফিসানি ছাড়া তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। ফলে এরকম কি মনে হয় না যে মানুষ ধরে নিয়েছে যে এটাই রাজনীতির পরিবর্তিত স্বাভাবিক ধারা, এভাবেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়। অর্থাৎ এদের কুৎসিত বিকৃত হুমকি ধমকি যতটা না ভয়ের তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ের ব্যাপার হলো যে এই বিকৃতিগুলোকেই মানুষ স্বাভাবিক বলে ভাবতে শুরু করেছে।

আবার যারা একটু মনস্তাত্ত্বিক লাইনে ভাবনা চিন্তা করেন তারা হয়তো বলবেন শত্রুদের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত চেহারা কল্পনা করা ও প্রত্যক্ষ করা একচ্ছত্র ক্ষমতাধর মানুষদের আদিম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় পুরাণের কংস থেকে শুরু করে হাল আমলের পলপট বা যোশেফ স্তালিনরা বহু রক্ত ঝরিয়েছে। ফলে সাড়ে তিন দশক ধরে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সিপিএম নেতারা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে রক্ত ঝরানোর হুমকি দেবেন ও রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাবেন এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে। তাছাড়া একথা তো ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত যে বামপন্থী রাজনীতির ধারাটিই তো খুনোখুনি, রক্তারক্তি, এলাকা দখল ও বিরোধী শক্তিকে শারীরিক ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ঐতিহ্য সম্পন্ন ধারা। সেদিক থেকে সিপিএম ও মাওবাদীদের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু এইটুকুই যে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সিপিএম খুন-জখম চালিয়ে যাচ্ছে। আর খুন-জখম করে মাওবাদীরা ক্ষমতায় আসতে চাইছে।

> **"প্রতিপক্ষ যোদ্ধা হলেও না হয় একটি সান্ত্বনা ছিল কিন্তু আমাদের লোক নয় স্রেফ এই সন্দেহের বশে যখন নারীপুরুষ নির্বিশেষে নিরীহ গ্রামবাসী বনবাসী মানুষগুলোকে মেরে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে রাখা হয় তখন কি মনে হয় না যে মাওবাদীরা/মার্কসবাদীরা হেডহান্টারদের চেয়েও ভয়ঙ্কর? কারণ হেড হান্টাররা মহিলা বা প্রতিপক্ষ যোদ্ধা নয় এমন কারও মাথা শিকার করেছে এমন নজির কিন্তু ইতিহাসে নেই।"**

কর্তৃত্ব কায়েম করার প্রবৃত্তি মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। বনের পশুপাখি, ফলমূল, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গাছগাছালির উপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করার জন্য আদিম মানুষ এলাকা দখল করত। এর জন্য খুনোখুনী রক্তারক্তি হোত। সেই আদিম মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হলো তখন সেই সমাজের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করার প্রতিযোগিতা শুরু হলো। সেই প্রতিযোগিতায় জেতার একমাত্র মাধ্যম ছিল গায়ের জোর। শারীরিকভাবে বলশালী কুশল যোদ্ধারাই সে সময়ের অর্ধসভ্য সমাজগুলোতে কর্তৃত্ব কায়েম করত।

যেমন, নাগাদের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এলাকার নেতা নির্বাচিত হোত হেড হান্টিং (Head Hunting) প্রথার মাধ্যমে। এই নিয়মে প্রতিযোগী পুরুষরা পরস্পর যুদ্ধে রত হোত। এই যুদ্ধের লক্ষ্য হলো প্রতিপক্ষের

(এরপর ৪ পাতায়)

সমাজ সেবা ভারতীর বাৎসরিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "সমাজের আর্ত-দরিদ্র-দীন-দুঃখী মানুষের সেবা করে চলেছে সমাজ সেবা ভারতী। সেবার দ্বারা সংস্কারের কাজও চলছে সমান তালে। স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি'র মাধ্যমে প্রথম সেবার কাজ শুরু করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর স্বয়ংসেবকরা। সেই ঐতিহ্য ধরেই সমাজ সেবা ভারতী সেবা ও সংস্কারের কাজ করছে। ভারতীয় সনাতন চিন্তন ও আদর্শই মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার সন্ধান দিতে পারে। সেজন্য ভারতীয় দর্শনের 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' আমেরিকায় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।" সমাজ সেবা ভারতীর কার্যকর্তাদের সামনে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি কলকাতার কল্যাণ ভবনে গত ১৯ সেপ্টেম্বর সমাজ সেবা ভারতীর বার্ষিক বৈঠকের সমাপ্তি ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি উপস্থিত কার্যকর্তাদের সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ, আনন্দ উৎসবের দিনেও পীড়িত-দরিদ্রদের মনে রাখা এবং অন্তরের সদিচ্ছাকে জাগ্রত করার আহ্বান জানান। সমাজ সেবা ভারতীর বিগত এক বছরের কার্যবিবরণী পেশ করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অহিজিৎ কুমার চৌধুরী।

তিনি বিভিন্ন সেবা প্রকল্পের মুদ্রিত বিবরণ সকলের হাতে তুলে দেন। সকাল এগারোটায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে বার্ষিক বৈঠকের উদ্বোধন করেন পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র সঙঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন আগামী এক বছরের নতুন কর্মসমিতি গঠিত হয়।

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ গুরুশরণ প্রসাদ, অদ্বৈতচরণ দত্ত, অতুল কুমার বিশ্বাস ও রমাপদ পাল।

বর্তমানে সমাজ সেবা ভারতীর আজীবন সদস্য ৬২ জন। প্রতিবছর সাধ্যমতো দরিদ্রদের পুজো উপলক্ষে নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়। এদিন অনেকে এজন্য সমাজ সেবা ভারতীর কোষাধ্যক্ষের কাছে নগদ অর্থ জমা দেন।

সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছে সীতেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সহ-সভাপতি — ডাঃ নরেশ চন্দ্র নাথ এবং ডঃ মানিক চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক— ডাঃ গোপাল কর, সহ-সম্পাদকদ্বয়— অলক মুখার্জী এবং শ্রীমতী শাশ্বতী নাথ, কোষাধ্যক্ষ— সুব্রত সামন্ত, কার্যালয় সম্পাদক— কমল চট্টোপাধ্যায়, সদস্যবৃন্দ — ডাঃ সনৎকুমার বসুমল্লিক, দিলীপ আঢ্য, মনোজ চট্টোপাধ্যায়, অহিজিৎ কুমার চৌধুরী এবং হিমাংশু মাইতি। আমন্ত্রিত সদস্য— শঙ্কর কুমার মিত্র, রঞ্জনকান্তি ভুঁঞা এবং দীপ্তাশীষ দত্তরায়।

ভাষণরত অদ্বৈতচরণ দত্ত। বসে রণেনদা, সীতেশ ভট্টাচার্য, সুনীল গোস্বামী ও গুরুশরণজী।

মেদিনীপুরে সংস্কার ভারতীর জন্মাষ্টমী উৎসব

প্রতি বছরের মতো এবছরও ১ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন সংস্কার ভারতী, মেদিনীপুর নগর শাখার পরিচালনায় জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয় স্থানীয় রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির হলে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় দুপুরে অঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এই প্রতিযোগিতায় ৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। বিকেলে একটি শোভাযাত্রা বের হয় বক্সীবাজার সরস্বতী শিশু মন্দির থেকে। তারপর শুরু হয় কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা ৬ টায় সূচনা হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া মেদিনীপুর শাখার প্রাক্তন ম্যানেজার মৃগাঙ্ক শেখর মাইতি। আই আই টি (খড়্গপুর)-এর অধ্যাপক সুকুমার মাইতি ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রের সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য, সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের দায়িত্ব প্রাপ্ত কার্যকর্তা ভরত কুণ্ডু, পশ্চিমবঙ্গ সংস্কার ভারতীর সহ সভাপতি ও দূরদর্শন এবং বেতার শিল্পী আশিস কর্মকার। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মোৎসব উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ১১ জুলাই হয়েছিল তার প্রতিটি বিভাগের সেরা তিনজনকেও ওইদিন পুরস্কৃত করা হয়। সমস্ত প্রতিযোগিতা মিশিয়ে প্রায় ৬৩ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সন্ধ্যা ৭ টায় নৃত্য-সহযোগে ভাবসঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শাখার সদস্য ও সদস্যরা সমবেত সঙ্গীত ''তিমির বিদারী...'' সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন। একক সঙ্গীত পরিবশেন করেন দূরদর্শন ও বেতার শিল্পী আশিস কর্মকার, ডিডি বাংলায় "এত সুর এত গানে" সফল প্রতিযোগী শুচিস্মিতা চক্রবর্তীসহ বিশিষ্ট শিল্পীগণ। সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন মেদিনীপুর শাখার শিশু শিল্পী সুকন্যা চক্রবর্তী, পূজা মাঝি, শর্মিষ্ঠা পাল। অন্বেষা পাল, দেবপর্ণা চক্রবর্তী ও রিয়া কর্মকার। শতিনেক দর্শক ও শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরপাড়ায় সংস্কার ভারতীর জন্মাষ্টমী পালন

ভদ্রকালী গার্লস কলেজের প্রশস্ত হলঘরের জন্মাষ্টমীর সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতীর উত্তরপাড়া শাখা-সম্পাদিকা উমা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ভাব-সঙ্গীত 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী...'-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সংস্কার ভারতীর প্রদেশের সহ-সভাপতি দেবাশীষ ভট্টাচার্য হিন্দুর জীবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ও সংস্কার ভারতী কেন এই দিনটি পালন করে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। তারপরেই শুরু হয় অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ— শিশুদের কৃষ্ণরূপ সজ্জা। দুই থেকে দশ বছর বয়সের প্রায় চল্লিশজন শিশু কৃষ্ণের বিভিন্ন সাজে সেজে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন। এরপর চিত্রা মুখার্জী ও রীতা দাস দ্বৈতকণ্ঠে ৩টি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ভজন গেয়ে শোনায়। পরবর্তী পর্যায়ে দীপা চৌধুরীর পরিচালনায় ও শ্রাবণী চক্রবর্তীর সহযোগিতায় ছোট ছোট মেয়েরা নৃত্য প্রদর্শন করেন।

কৃষ্ণসজ্জায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে একটি গোপাল মূর্তি ও শংসাপত্র দিয়ে অভিনন্দিত করেন শাখা সভাপতি বিজয় কুমার চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংস্থার প্রবীণ সদস্য সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলাগড়ে কৃষ্ণ-সাজো প্রতিযোগিতা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলাগড় প্রখণ্ডের পরিচালনায় কোলড়া অরুণাশ্রম সেবা সঙেঘর প্রাঙ্গণে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সাপ্তাহিক স্বস্তিকা'র ব্যবস্থাপক অভিজিৎ রায়চৌধুরী। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ তিতিক্ষানন্দ ব্রহ্মচারী। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের উপর আলোকপাত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর প্রাক্তন প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ বাসুদেব ঘোষ। শ্রীকৃষ্ণের সাংগঠনিক চিন্তাধারা বর্ণনা করেন স্বামী উত্তমানন্দ মহারাজ, সন্ধ্যায় শিশুদের "কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা" এক মনোজ্ঞ পরিবেশের সৃষ্টি করে। এবার প্রতিযোগী ছিল ২৫ জন। প্রায় ৭৫০ জন ভক্ত কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সবশেষে সভাপতির ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

নিরপেক্ষ থাকুন

(১ পাতার পর)

করে বিবৃতি না দেন। কোনও বেঁফাস মন্তব্যও যেন তাঁরা এনিয়ে না করেন। এব্যাপারে যা কিছু বলার একমাত্র দলনেত্রীই তা বলবেন।" কিন্তু মুসলিম-তোষণে অভ্যস্ত মায়াবতীর দলের হঠাৎ এরূপ অবস্থান কেন? সেই বরিষ্ঠ পার্টি-নেতার বক্তব্য,— "উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে আমাদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সংখ্যালঘু ভোট-ব্যাঙ্ক পুষ্ট করতে গিয়ে আমরা সেই ব্রাহ্মণ-ভোটব্যাঙ্ক হারাতে চাই না। অন্যদিকে মুসলিম সমাজেও আমাদের বহু সমর্থক রয়েছেন। তাদের মনেও আমাদের অযোধ্যা ইস্যুতে কার্যকলাপ নিয়ে সন্দেহের কোনও বাতাবরণ তৈরি করতে চাই না।"

মিডিয়ার একাংশের অপপ্রচার

(১ পাতার পর)

এ সবই করা হয়েছে নিরাপত্তার অজুহাতে। মুখে না বললেও উত্তরপ্রদেশের মায়াবতী সরকার এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার হিন্দুদের দিকেই আঙুল তুলেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো প্রায়ই বলেন 'গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ' ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষতি করছে। মিডিয়া লুফে নেয়। টিভি চ্যানেলে বিশেষ পছন্দের বুদ্ধিজীবী, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট নেতাদের ডেকে আলোচনার নামে চলে হিন্দু ধর্মের কুৎসা প্রচার একতরফাভাবে। বক্তারা গলাবাজি করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন হিন্দুরাই ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু। যত নষ্টের গোড়া। কারণ, ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে শ্রীরামমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে দেশের সর্বনাশ করছে। হিন্দুর পবিত্র তীর্থে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া যে 'মহা অপরাধ'— তা মিডিয়ার পেটোয়া বুদ্ধিজীবীরা জানিয়ে দিয়েছেন। মন্দির চাইলে 'গেরুয়া সন্ত্রাসবাদী' বলে 'পোটা' আইনে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

মিডিয়া প্রথম থেকেই শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছে। অযোধ্যায় বাবরের জয়সৌধকে পবিত্র মসজিদ বলে চালিয়ে দেওয়াটাও মিডিয়ার ষড়যন্ত্র। ইতিহাস সাক্ষী, বাবর এই ধাঁচা অযোধ্যায় নির্মাণ করিয়েছিলেন হিন্দুর ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য। ইসলামের তরবারির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। হিন্দুদের প্রতিনিয়ত স্মরণ করাতে যে তারা ইসলামের পদানত ক্রীতদাস। সেই সৌধকে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের পর থেকে মসজিদে পরিবর্তিত করার অনন্য কৃতিত্ব মিডিয়ার।

এবার আদালতের রায় ঘোষণার দুই সপ্তাহ আগেই মিডিয়া তীব্র অপপ্রচার শুরু করেছে। বলা হচ্ছে, কাশ্মীরে হুরিয়তের সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগাবে শ্রীরামজন্মভূমি মামলার রায়। কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। দিল্লীতে কমনওয়েলথ গেমস বিঘ্নিত হবে। এর জন্য দায়ী হবেন হিন্দুরা। কারণ, তাঁরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। হ্যাঁ, ভারতে আজ সংখ্যাগুরু হওয়াটা অপরাধ। শিক্ষা, চাকরি সবই সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত।

শ্রীলঙ্কায় ঘাঁটি

(১ পাতার পর)

'পরিকল্পনাকারী ও সুবিধাভোগী' (প্ল্যানারস ও ফেসিলিটেটস) যারা প্রশিক্ষিত হয়েই শ্রীলঙ্কায় গেছিল এবং বর্তমানে ভারতে বড় ধরনের নাশকতা চালানোর জন্য একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে।

এমতাবস্থায় নয়াদিল্লী শ্রীলঙ্কা-সরকারের ওপরই ভরসা করতে চাইছে। তারা চাইছে বিপদের গুরুত্ব অনুভব করে লঙ্কা-সরকারও সংবেদনশীল হয়ে উঠুন। এমনিতে, ২৬/১১-এর ঘটনার পর ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় আলাদা জোর দেওয়া হয়েইছে। সুতরাং সন্ত্রাসবাদীদের স্বাভাবিক স্ট্রাটেজি হলো শ্রীলঙ্কার মাধ্যমে ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূল কব্জা করে সেদিক দিয়ে আক্রমণ শানানো। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা আরও জানিয়েছে নেপাল ও মালদ্বীপেও তাদের জাল বিস্তার করছে লস্কর। কূটনৈতিক মহল উদ্বিগ্ন যে কারণে তা হলো, সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধে পাকিস্তানের ওপর এখনও পর্যন্ত কোনও আন্তর্জাতিক চাপ আসেনি। যে জন্য লস্কর পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই তার জালবিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

মাথা শিকারীদের দিয়ে

(৩ পাতার পর)

যোদ্ধাদের মাথা কেটে তা সংগ্রহ করা। যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মাথা শিকার করতে পারতো সেই হোত ওই এলাকার নেতা। কোহিমার মিউজিয়ামে এখনও হেড হান্টারদের থেকে সংগৃহীত এরকম দু'চারটে খুলির সন্ধান পাওয়া যাবে।

নাগাভূমিতে এখন হেড হান্টিং নেই। কিন্তু সিপিএম নেতা-মন্ত্রীদের মাথা গুড়িয়ে দেব, মাথা ভেঙে দেব হুঙ্কারের পর যখন নন্দীগ্রাম বা লালগড়-এর মতো এলাকা দখলের উদ্দেশ্যে মুখে গামছা বাধা হার্মাদরা মারণাস্ত্র নিয়ে জনপদগুলোতে দাপিয়ে বেড়ায় তখন কি মনে হয় না এই বঙ্গভূমিতে হেড হান্টিং একটি স্বীকৃত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিপক্ষ যোদ্ধা হলেও না হয় একটি সান্ত্বনা ছিল কিন্তু আমাদের লোক নয় স্রেফ এই সন্দেহের বশে যখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিরীহ গ্রামবাসী বনবাসী মানুষগুলোকে মেরে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে রাখা হয় তখন কি মনে হয় না যে মাওবাদীরা/মার্কসবাদীরা হেডহান্টারদের চেয়েও ভয়ঙ্কর? কারণ হেডহান্টাররা মহিলা বা প্রতিপক্ষ যোদ্ধা নয় এমন কারও মাথা শিকার করেছে এমন নজির কিন্তু ইতিহাসে নেই।

তবে আশার কথা এই যে খুব জখম বা এলাকা দখলের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পেছনে যে মার্কসবাদী/মাওবাদীদের আদর্শগত প্রেরণা রয়েছে এই বিষয়টি রাজ্যবাসীর কাছে পরিষ্কার। না হলে সংবিধানের নামে শপথ নেওয়া মন্ত্রীরা খুন জখমে নেতৃত্ব দিয়ে সংবিধান স্বীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অচল করে এই বাংলার মাটিতে একটি অর্ধসভ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করে কি করে। মানুষের মাঝে কান পাতলে শুনা যায় অনেক হয়েছে এবার এদের যাওয়া দরকার। তাছাড়া টানা সাড়ে তিন দশক ভয় সন্ত্রাসের পরিবেশে থাকতে থাকতে মানুষ একটু বেপরোয়া বলেই এদের হাড়হিম করা হুমকিতে এখন আর তেমন কেউ ভীত সন্ত্রস্ত হয় না। তবে একটু খোঁজ নিলে বোঝা যাবে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মানুষ যেন ক্রমশ একটু বেশিই যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়ছে। কারণ তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে আজ যে মানুষগুলো সমস্যা সৃষ্টি করছে তারাই নতুন মুখোশ পরে পোশাক পাল্টে ঘাসফুলের ভিড়ে মিশে যাচ্ছে।

রাজ্য রাজনীতি

বঙ্গীয় যুবকদের সর্বনাশের পথে ঠেলছে সিপিএম-কংগ্রেস

নিশাকর সোম

নবপ্রজন্মের যুব-সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রায় সব রাজনৈতিক দলের উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। এটা একান্তই সত্য যে, রাজনীতি করার জন্য যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে না। অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে অবিভক্ত বঙ্গেই শুধু নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বিশেষ করে এ-রাজ্যে একটা সময় সরকার-বিরোধী আন্দোলনে প্রথম সারিতে দেখা যেত যুব-সম্প্রদায়কে। আজ সে-অবস্থাও নেই। তখন যেমন সরকার-বিরোধী দলে যুব-সম্প্রদায়ের ভীড় দেখা যেত— পাশাপাশি কংগ্রেসের মধ্যে বহু তরুণকে নেতৃত্বের সারিতে দেখা যেত। কংগ্রেসের মধ্যে 'তরুণ তুর্কি' অভিধাটি চালু হয়েছিল তখনই। এখন সে অবস্থাও নেই।

তাই তো যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখা হচ্ছে— নেতা তৈরি করুন, নেতা হন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে যুব-সম্প্রদায়ের সামনে দেশের মুক্তির আদর্শ ছিল— সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার যুবক-যুবতী প্রাণপণ করে এগিয়ে এসেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেসের নেতারা ক্ষমতায় বসে যুব-সম্প্রদায়ের সামনে দেশ গঠনের জন্য কোনও ইতিবাচক কর্মসূচি রাখতে পারেননি— তাই যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হননি। পক্ষান্তরে তদানীন্তন নেতাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, দেশের মধ্যে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি না করা, সর্বোপরি ধীরে ধীরে ক্ষমতাধারীদের মধ্যে দুর্নীতি এবং স্বজন পোষণ-এর নগ্ন রূপটা যতই প্রকট হতে লাগলো ততই যুব সমাজের বৃহৎ অংশ রাজনীতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে লাগলেন।

তাই তো কংগ্রেস-নেতৃত্বের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে যুব কংগ্রেস-কে সংগঠিত করার প্রয়াসে বিপুল অর্থ দিয়ে 'নেতা হবার' কথা শুনিয়ে রাস্তায় বুথ খুলে যুব-কংগ্রেসের জন্য সদস্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কলকাতায় কয়েকটি জায়গায় এমন লোককেও দেখা যাচ্ছে— যিনি যুব কংগ্রেসের সদস্য হচ্ছেন, তিনি তৃণমূলের হয়ে ভোটে কাজ করছেন— আবার তিনিই বামপন্থীদের যুবসংগঠনের সদস্য আছেন।

স্বাধীনত্তোর পর্বে বামপন্থী যুব সংগঠন গড়ার কথা প্রথমে ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির প্রচেষ্টায় 'বিশ্ব যুব উৎসব' করা হয়। সেই আদলে পশ্চিমবঙ্গেও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যুব-উৎসব করে এবং বিশ্ব যুব উৎসবে এ বঙ্গের অনেকেই যোগদান করেন। এর প্রথম পর্যায়ের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যুব সংঘ তৈরি করে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে খোঁপা বাধার এবং দেখানোর প্রতিযোগিতা করা হয়। সিপিএম গঠিত হওয়ার পর কলকাতায় প্রথম যুব ফেডারেশন গঠিত হয়। সেখান থেকে সিপিআই-এর যুব সংগঠনের নিন্দা করে ঘোষণা করা হয় যে— যুব সম্প্রদায়কে বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।

এ-সবই কথার কথা— কারণ সিপিএম ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করে ক্ষমতার জন্য ভোটে জেতাটাই পরম ব্রত মনে করতে থাকে। তদনুযায়ী যুব-সম্প্রদায়কে ভোটের কাজে লাগানো হয়।

ধীরে ধীরে যুবসংগঠনগুলিতে পেশী শক্তিধররাই মাতব্বর হয়ে ওঠেন— ফলে যুবসম্প্রদায়ের একটা ভাল সংখ্যাকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়।

একদিকে যখন যুব-সম্প্রদায়কে আদর্শচ্যুত করা হয়, সেই সঙ্গে নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়ের পাঁকে যুব সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে বামদলগুলি। ফলে বামকর্মী-যুবকরা হয়ে ওঠেন মারমুখী। যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে নেতা হওয়া মন্ত্রী হওয়া— প্রভৃতি লিপ্সাকে উস্কে দেওয়া হয়। যুব সমাজের মধ্যে এক ইউরোপীয় ভোগবাদী দর্শনের প্রভাব পড়ে। প্রবীণদের যথাযথ সম্মান না জানানো অপসংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি করে টিভি এবং এখনও টিভি-এর অনুষ্ঠানে পরকীয়া প্রেম, অর্ধ-উলঙ্গ নাচ-গানের নামে হল্লা হচ্ছে। এ সবই বামশাসনে বেড়ে গেছে। আজ বামপন্থী যুবকরা নীতি-নৈতিকতার ধারেকাছেও নেই। ভোটে জেতার কাজে দাদারা লাগায় খালি সেই দাদারা শক্তিধর যুবকদের সব কাজের লাইসেন্স দেন। তাই এসব সিপিএম-পন্থী যুবনেতাদের মুখে অহঙ্কার এবং হিংসাত্মক কথার ফুলঝুরি ছোটে। এসব নেতাদের কথা অশ্লীল। উদাহরণ হলো—বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু, বিনয় কোঙার ও শ্যামল চক্রবর্তী। সম্প্রতি একজন সাংবাদিক জানালেন দিল্লীতে প্রয়াত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তীর পুত্রের সঙ্গে আলোচনার সময়ে বিমান বসু নাকি তাঁকে চপেটাঘাত করেন। বিমান বসু তো সাংবাদিকদের 'বরাহনন্দন' বলেছিলেন। এরা কি করে যুবসম্প্রদায়কে সুস্থ-ন্যায়নীতির আদর্শ দেখাবেন?

কংগ্রেসও সেই পথের পথিক হবে—যে ভাবে যুব কংগ্রেস এগোচ্ছে তাতে এই কথাই প্রমাণিত হয়। আজকে যুবকদের একাংশের মধ্যে মদ্যপান বেড়ে গেছে। যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিদেশি সাজপোশাক দেখা যাচ্ছে।

এর ফলে ভাল ছেলেরা আর রাজনীতি করতে চাইছেনা। নিজেদের কেরিয়ার গড়ার দিকেই মন দিচ্ছে। কারণ তাঁরা দেখছেন 'দাদারা' গাড়ি-বাড়ি করে নিজের পরিজনদের চাকরি দিয়ে রাজনীতির পরিবর্তে মিথ্যার বেসাতি করছেন।

এই পটভূমিতে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে। ধর্মতলায় সিপিএম-নেতা দীপক সরকার বলছেন— "লালগড় দখল করা হয়ে গেছে। এবার খেজুরি-নন্দীগ্রাম দখল করা হবে।" এর জবাবে তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের যুবনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন "বঁটি, কাটারি নিয়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।" তৃণমূল নেত্রী বলেছেন "ইচ্ছা করলেই হার্মাদবাহিনীকে শেষ করে দেওয়া যায়।"

উল্লেখ করা প্রয়োজন আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই হয়তো যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করা হতে পারে। তখন আবার তৃণমূলের নেতৃত্বে পুনর্দখলের অভিযান শুরু হবেই। ফলে এ-রাজ্যে এক গৃহ যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হচ্ছে। বহু নিরীহ যুবককে 'দখলের লড়াইতে' কাজে লাগানো হচ্ছে এবং হবেও। সিপিএম-বামপন্থীদল কংগ্রেস-তৃণমূল প্রত্যেকেরই লক্ষ্য মারি-অরি যে-ভাবে পারি। তাঁদের কথা— নাথিং ইজ রঙ ইন পলিটিক্স। এইসব দলগুলির একটিমাত্র কর্মসূচী— ক্ষমতা দখল করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা। তাই এঁরা যুব সমাজকে সেইদিকেই পরিচালিত করেছেন এবং আরও করবেন। একটা প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। আজকের যুবকর্মীরা জনসাধারণকে পলিটিক্যালি পারসুয়েশান করেন না, তাঁরা ফিজিক্যাল পারসুয়েশান-এর পথ নিয়ে থাকেন।

এই অবস্থার একটা নেতিবাচক ফল দেখা যাবে— তা'হল এই যুবসমাজকে বেকারির হাত থেকে মুক্ত করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে মাওবাদীদের নাম করে একদল ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হবে। এক কথায় বলা যায় এ রাজ্যের যুবকদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে বামপন্থী নেতারা। এখন রাহুল গান্ধীও কি সেই পথে যাচ্ছেন না?

সিপিএম গ্রাম-অঞ্চল পুনর্দখলের যে ছক তৈরি করেছে। তাতে নিচের তলার পার্টিকর্মীদের দাবা খেলার বোড়ের মতো ব্যবহার করছেন। এক ভয়ঙ্কর রাজনীতির পাশা খেলায় মেতেছেন দুই যুযুধান গোষ্ঠী —এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের নির্বাচনের সময়ে কেন্দ্রীয়বাহিনীর একটা বড় অংশকে বিহারে নিয়ে যাবে। তখন এরাজ্যে অপর পক্ষ পুনর্দখলের অভিযানে নামবে! এই ভাবেই এ রাজ্য গৃহযুদ্ধের সূচনা হবে। সিপিএম ইতিমধ্যেই পুনর্দখল করা এলাকায় গোপন সংগঠন গড়ে তুলছে— যাতে বিধানসভা নির্বাচনের পর ঝড় সামলাতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যায় এই কলামে লেখা হয়েছিল যে দীপক সরকার বিমান বসুর স্থলে দায়িত্ব নেবেন। বস্তুত তাই হচ্ছে। কলকাতা জেলা সিপিএম-এর জমায়েতে কলকাতার নেতারা দীপক সরকারকেই বক্তা হিসেবে চেয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে—রবীন-বিমান চলবে না, বহুদিন আগেই কলকাতা পার্টি বুদ্ধ বাবুকে অপছন্দের কথা জানিয়েছিল। রাজ্য সিপিএম-এর ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব নেতৃত্বের সংকটে রয়েছেন। বুদ্ধ বাবুর স্থানে অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্তকে সমান্তরাল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে— এ কথা বহু পূর্বেই স্বস্তিকাতে লেখা হয়েছিল।

রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভা হয়েছে। সেখানে সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর মনোনীত সভাপতি নির্বাচনের কর্তৃপক্ষ বীরেন্দ্র কাটারিয়া ছিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন 'প্রিয়বাবু সঙ্গে নেই'। তৎক্ষণাৎ দীপা দাসমুন্সি মঞ্চে গিয়ে তীব্র ভাষায় বীরেন্দ্র কাটারিয়াকে বাক্যবাণে জর্জরিত করেন। মানস-বিরোধী গোষ্ঠীও ফাইট বিগ্রেড হয়ে ওঠেন। শেষমেশ কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি চয়ন করার দায়িত্ব দেওয়া হলো এক প্রস্তাবের মারফত। বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন পর্যন্ত চুপচাপ চলবে তারপর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এক নতুন আকার ধারণ করবে। উল্লেখ্য সেখানে সাংসদ তথা মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরী অনুপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস-কংগ্রেসেই আছে। ভবিষ্যতে কর্মীদের একাংশ বিভিন্ন দলে চলে যাবেন। শুধু প্রার্থী মনোনয়ন পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষারত।

সিপিএম-বামপন্থীদল কংগ্রেস-তৃণমূল প্রত্যেকেরই লক্ষ্য মারি-অরি যে-ভাবে পারি। তাঁদের কথা— নাথিং ইজ রঙ ইন পলিটিক্স। এইসব দলগুলির একটিমাত্র কর্মসূচী— ক্ষমতা দখল করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা। তাই এঁরা যুব সমাজকে সেইদিকেই পরিচালিত করেছেন এবং আরও করবেন। একটা প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। আজকের যুবকর্মীরা জনসাধারণকে পলিটিক্যালি পারসুয়েশান করেন না, তাঁরা ফিজিক্যাল পারসুয়েশান-এর পথ নিয়ে থাকেন।

অন্য রকম

বন্ধু তোমার সাথীকে...

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এমন অসম-বন্ধুত্বও হয় তাহলে! একটা ওরাংওটাং আর একটা কুকুরের? না, না এটাকে একেবারেই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অপ্রকাশিত গল্প বলে ভেবে বসবেন না। কিংবা উপেন্দ্র-পুত্র সুকুমার রায়ের 'হলদে-সবুজ ওরাংওটায়, ইট-পাটকেল চিৎপটাং' গোছের হযবরল বা আবোল-তাবোল বলেও জিনিসটাকে উড়িয়ে দেবেন না মোটেও। একেবারে বাস্তবিক ঘটনা। মাত্র তিন বছর বয়সেই সেই ওরাংওটাংটি পিতৃ-মাতৃহারা হয়। নাম তার সূর্য। অকস্মাৎ বাবা-মাকে হারিয়ে ওরাংওটাংটিকে গ্রাস করে হতাশা। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। উপযুক্ত চিকিৎসা করানোরও চেষ্টা হয়। কিন্তু কোনও মেডিকেল ট্রিটমেন্টেই সাড়া দেয় না সে। ডাক্তাররা পড়ে যান মহামুশকিলে।

চিনে নিও ঃ সূর্য এবং রস্কোর অটুট বন্ধন।

কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খন্ডাবে কে? প্রসঙ্গত, কলিযুগের এই সূর্যটির নিবাস উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়ার একটি চিড়িয়াখানায়। সেই চিড়িয়াখানা চত্বরেই চিড়িয়াখানা-রক্ষক একদিন দর্শন পান একটা অসুস্থ ও বৃদ্ধ সারমেয়-র, নাম রস্কো। প্রথমদিকে কুকুরটিকে নেহাতই নগণ্য বা তুচ্ছ বলে মনে হলেও, নেহাতই কর্তব্যের খাতিরে তাকে চিকিৎসার প্রয়োজনে চিকিৎসালয়ে ঢোকানোর পর বোঝা গেল সূর্যের মোক্ষম ওষুধ পাওয়া গিয়েছে। সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে অস্তিত্ববাহী এই দু'টো জন্তুর মুখোমুখি দর্শনে ভাগ্য-দেবতা বোধহয় সেদিন মুচকি হেসেছিলেন। নইলে ঠিক ওই চিকিৎসালয়েতেই বা ওই ওরাংওটাংটির চিকিৎসা চলবে কেন? সেই প্রথম দর্শনেই বৃদ্ধ কুকুরটি আর বাচ্চা ওরাং-ওটাংটি ওই যে একাত্ম হলো, তারপর বেশ কয়েকমাস অতিক্রান্ত হবার পরও তা অবিচ্ছেদ্য।

সূর্য যেমন রস্কোর সান্নিধ্যে এসে বাঁচার নতুন মানে পেয়েছে। বিষাদ কেটেছে মনে এসেছে হর্ষ। অন্যদিকে তেমনি রস্কো সূর্যের নৈকট্য পেয়ে তারুণ্যের অর্থ বুঝেছে, বাঁচার তাগিদ পেয়েছে। ওই দু'টি প্রাণী আজ পরস্পরের খেলার সাথী, সর্বক্ষণের সঙ্গী। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি 'বিনোদন' হলো সাঁতার। সূর্যের কিন্তু জল সম্পর্কে একটা ভয়-ভীতি রয়েছে। তাই সাঁতার কাটতে সে একটু অসুবিধেই বোধ করে। সম্ভবত তার পূর্ব-পুরুষ বাঁদরদের থেকেই এই 'জল-ভীতি' ব্যাপারটা রপ্ত করেছে সে। কিন্তু সারমেয়কুলের ইতিহাস তো অন্য কথা বলছে। তাদের তো জলভীতি থাকার কথা নয়। রস্কো ঠিক সেটাই প্রমাণ করলো। সেইই উদ্যোগী হয়ে সূর্য-র জলভীতি কাটিয়েছে, শিখিয়েছে সাঁতার। বন্ধুত্ব তাহলে অসাধ্য-সাধনও করতে পারে!

ত্রিপুরা ডিজি-র বয়ান— আই এস আই সক্রিয় উত্তর-পূর্বে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর হুমকি রয়েছে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে। আই এস আই মদতপুষ্ট কিছু জঙ্গি সংগঠনও সক্রিয় রয়েছে এই অঞ্চলে। শুক্রবার রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য জানান ডি জি পি প্রণয় সহায়। উল্লেখ্য, গত পঁচিশ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট দিল্লীর বিজ্ঞানভবনে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজ্যগুলির ডি জি পি'দের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলন শেষে রাজ্য পুলিশের ডি জি পি প্রণয় সহায় গত ৩ সেপ্টেম্বর আগরতলায় সাংবাদিক বৈঠক করেন। ডি জি পি জানান, ত্রিপুরায় কাউন্টার ইন্সারজেন্সি এণ্ড টেররিস্ট স্কুল খোলার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যদিও বড় রাজ্যের ক্ষেত্রে এই বরাদ্দ তিন কোটি টাকা। ফলে এ রাজ্যের ক্ষেত্রেও তিন কোটি টাকা বরাদ্দের দাবী জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, ধর্মনগরের বগাবাসায় এই স্কুল হওয়ার কথা রয়েছে। দিল্লীর সম্মেলনে ডিজিপি জানান, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চাপে সে দেশে

ডি জি প্রণয় সহায়

ঘাঁটি করে থাকা উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গি-গোষ্ঠীগুলি তাদের ঘাঁটি মায়ানমারে সরিয়ে নিচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের খাগরাছড়ি এলাকায় এন এল এফ টি'র তিনটি ঘাঁটি ধ্বংস করে সেখানে হেলিপ্যাড তৈরি করেছে বাংলাদেশের আর্মি। এছাড়া সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোকে অর্থের যোগান রদের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন ডি জি পি প্রণয় সহায়। এক্ষেত্রে বর্তমান আইন বদল করে রাজ্য পুলিশও যাতে এ বাপারে ব্যবস্থা নিতে পারে তার জন্য ক্ষমতা প্রদানের কথা বলেন ডি জি পি। উল্লেখ্য, বর্তমান আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসারদেরই এই ক্ষমতা দেওয়া আছে। রাজ্যের ৩৬০০ এস পি ও'দের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বরাদ্দ বৃদ্ধির উপরও কথা বলেন ডিজিপি। ফলে ডি জি পি'কে মন্ত্রক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এস পি ও'দের জন্য পাঁচশ-এর স্থলে দেড় হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে। দিল্লীর ওই কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রণয় সহায়কে ত্রিপুরার ব্যাপারে বাহবা দিয়েছেন বলে ডি জি পি দাবী করেছেন।

সোনামুড়ায় মুসলিম প্রণয়ীকে প্রহার এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিন্দু যুবতী ও তার মুসলমান প্রণয়ীকে বেধড়ক পিটুনি দিল পাড়ার যুবকরা। সংবাদে প্রকাশ ওই হিন্দু যুবকরা কিন্তু রাজ্যের শাসক দলের (সিপিএম) ক্যাডার। ঘটনাটা পশ্চিমবঙ্গ নয় ত্রিপুরার। ত্রিপুরার বাংলাদেশ সীমান্তে সোনামুড়া।

সোনামুড়ার চন্দনমুড়া গ্রামে এই গণপিটুনির ঘটনাটা ঘটেছে গত ১৩ সেপ্টেম্বর। সোনামুড়ার চন্দনমুড়া গ্রামের প্রাণবল্লভ দাসের যুবতী মেয়ে সুতপার সঙ্গে পাশেই বড়দোয়াল গ্রামের আতিকুল ইসলামের ভালোমতো ঘনিষ্ঠতা। পাড়ার ছেলেরা নজরে রেখেছিল। হিন্দু যুবতীর অভিভাবকদেরও প্রশ্রয় ছিল। দুই হিন্দু-মুসলমান বাড়িতে যাতায়াত খাওয়া-দাওয়াও চলতো।

সম্প্রতি দাস পরিবার সপরিবারে ঈদের নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছিল আতিকুলের বাড়িতে। পাল্টা নিমন্ত্রণ করেছিল আতিকুল-কে। কিছু একটা পাতানো সম্পর্কের সূত্র ধরে আতিকুলের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে প্রাণবল্লভের বাড়িতে আসতেই আগে থেকে নজরে রাখা পাড়ার যুবকরা ওই বাড়িতে চড়াও হয়। আতিকুলকে ভালোরকম উত্তমমধ্যম দেওয়া হয়েছে বলে হিন্দু পরিবারটি থানায় অভিযোগ জানিয়েছে।

বোনের সঙ্গে সুতপা।

হৈ-চৈ গোলমালের জেরে পাড়ার লোকেরাই থানায় খবর দিয়েছিল। পাড়ার যুবকরা দাসবাড়ির লোকেদেরও মারধর দিয়েছে বলে খবর।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তাতেও প্রতিবেশি যুবকরা দমেনি। কারও কারও অভিযোগ— ওই পঞ্চায়েতে শাসক দল হেরে গেছে গত নির্বাচনে। সেজন্যই এই অত্যাচার। প্রশ্ন উঠছে সেক্ষেত্রে যে কোনও দিন ঘটনা ঘটতে পারত। ওই দিনই ঘটল কেন? আর আতিকুল এসেছিল রাত দশটার পরে। হিন্দুবাড়িতে মুসলমান যুবকের নিমন্ত্রণ, তাও রাত দশটায়। সে নিশ্চয়ই রাত্রিবাসের জন্য এসে থাকবে। দাসপরিবার সপরিবারে ঈদের নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। তাও দিনেরবেলায়। আতিকুল কিন্তু একাই এসেছিল। প্রাণবল্লভ দাসের দরমার বাড়ি। বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুরের অভিযোগ জানানো হয়েছে থানায়। এদিকে অন্য সূত্র মতে, ঘটনাটি রাজনৈতিক। সুতপার এক ভাই ঠিকাদার। তার কাছে তোলার টাকা না পাওয়াতেই গন্ডগোল। এক পুলিশকর্তার মতে অবৈধ সম্পর্কের কথাটা সত্য নয়। এলাকার বিধায়ক সুবল ভৌমিক দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়েছেন। পুলিশ তদন্ত করছে।

মন্ত্রীর আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে সরব অখিল গগৈ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তর-কাছাড় পার্বত্য জেলায় (বর্তমানে ডিমা হাসাও জেলা) আর্থিক দুর্নীতির ব্যাপারটা জাতীয় তদন্ত সংস্থা জানিয়ে দিয়েছিল। তদন্ত শুরু হয়েছিল। দুর্নীতিতে অসমের রাজধানী দিসপুরের ক্ষমতাসীন দলের বরদ-হস্ত থাকার কথাও উঠেছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার বা জাতীয় তদন্ত সংস্থা (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) কোনও রাঘব-বোয়ালের নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেনি।

হিমন্ত বিশ্বশর্মা

তরুণ গগৈ

অখিল গগৈ

তবে এবার আরও একবার প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে চ্যালেঞ্জ জানালেন রাজ্যের কৃষক মজদুর সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক অখিল গগৈ। অখিল রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করেই দিয়েছেন গত ১৩ সেপ্টেম্বর দিসপুরে। আর এবিষয়ে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকেও একহাত নিয়েছেন। তরুণের উদ্দেশ্যে তিনটি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন—

(১) উত্তর কাছাড় জেলার হাজার কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে ব্যাপক জলঘোলা হলেও তিনি তাঁর ক্যাবিনেটের সদস্য মন্ত্রী বিশ্বশর্মার বিষয়ে কোনও তদন্ত না করিয়ে পরোক্ষ সমর্থনই করেছেন বলা যায়। সুতরাং এতে তিনিও অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন কি?

(২) দ্বিতীয়ত, কৃষক মজদুর সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদকের জিজ্ঞাস্য— হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে তদন্ত করাতে কি মুখ্যমন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন?

(৩) তৃতীয়ত, হিমন্তকে বাঁচাতে গিয়ে তরুণ গগৈ নিজেকে 'দোষী' মনে করছেন কি?

অখিল গগৈ একেবারে সাবধানবাণীর মতোই বলেছেন, ২৯/৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তরুণ গগৈ কোনও ব্যবস্থা না নিলে, তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির আরও সব অকাট্য প্রমাণ সর্বসমক্ষে তুলে ধরবেন।

কৃষক মজদুর সংগ্রাম সমিতি সাংবাদিক সম্মেলনে হিমন্তের দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবী জানিয়েছে। সমিতি ইতিমধ্যেই, হিমন্তবাবুর বিলাসবহুল গাড়ী এবং পুরীতে অসম যাত্রী নিবাস ও পানবাজার থানার টাডা মামলার এফ আই আর বিষয়ে প্রশ্ন তুলে তদন্ত চেয়েছে। এছাড়া আই এ এস অফিসার পি কে তেওয়ারিকে ভয় দেখানোর জন্য চাঁদমারি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

সমিতির (কে এম এস এস) সাধারণ সম্পাদক অখিলবাবু সাংবাদিকদের জানান, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় বনসৃজনের জন্য ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি ১২.১৬ কোটি টাকা তুলেছিল। পুরো টাকাটাই কোনও মন্ত্রীর 'আশীর্বাদে' চৌপাট হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর অসম সরকার গুয়াহাটি হাইকোর্টকে আবারও জানিয়েছেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার 'বনসৃজন-প্রকল্প' দুর্নীতির তদন্তের ভার সিবিআই-কে দেওয়া হয়েছে। আগে ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য সরকারকে হাইকোর্টের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। এবার হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাবতীয় কাগজপত্র (সি বি আই-কে তদন্তের দায়িত্ব সম্পর্কিত) হাইকোর্টে দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আগের শুনানীতে সাতদিনের মধ্যে যাবতীয় হলফনামা পেশ করতে বলা হয়েছিল।

অখিল গগৈ সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানিয়েছেন যে, গত ১০ সেপ্টেম্বর জনৈক আর এস গান্ধী নামের ঠিকাদার দিল্লী থেকে গুয়াহাটিতে এসেছিলেন। তিনি এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে যাতে 'তদন্তের ভার' সি বি আই-কে না দেওয়া হয়, সেরকমই অনুরোধ জানিয়ে গেছেন মন্ত্রীমহোদয়কে। অখিলবাবু আরও জানিয়েছেন, ওই গান্ধীবাবু হুমকি দিয়েছেন —"যদি সি বি আই তদন্ত হয় তাহলে তিনি নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হাইকোর্টকে ওই মন্ত্রীর ঘুষ নেওয়ার কথা জানিয়ে দেবেন"।

‘বাবর এদেশীয় মুসলমানদের পরিচয় নয়’ মহম্মদ হাসমি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ “জহীরউদ্দিন বাবর ভারতীয় মুসলমানদের ‘পরিচয়’ নয়। আমাদের পরিচয় খাজা গরীব নওয়াজ এবং তাঁর আধ্যাত্মিক বাণী।” এহেন বক্তব্যটি ইসলামী পণ্ডিত গাজী-ই-মিলায়েত হজরত সঈদ শাহ মহম্মদ হাসমি মিঞার। এই নব্য হজরত মহম্মদের ‘প্রফেট’ কিন্তু পয়গম্বর মহম্মদ-ই। সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের রায়পুরস্থিত শহীদ স্মারক ভবনে আয়োজিত সংখ্যালঘু উন্নয়ন সম্মেলনে এক আলোচনা চক্রে এই বক্তব্যটি রাখেন তিনি। এই আলোচনা চক্রটির আয়োজক ছিলেন ছত্তিশগড় রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ সলীম আশরফি। অনুষ্ঠানে মিঞার বক্তব্য ছিল রীতিমতো চাঁচাছোলা। তিনি বলেন, “অনেক মানুষই ভারতবর্ষে এসেছেন। বাবর তাঁদেরই একজন। খাজা গরীব নওয়াজ হজরত মঈনুদ্দিন চিস্তিও এমনই ব্যক্তি। কিন্তু এঁদের দু’জনের এদেশে আসার উদ্দেশ্য আলাদা ছিল। বাবর এসেছিলেন এদেশের জমি দখল করতে এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করতে। কিন্তু খাজা চিস্তি এসেছিলেন দীন (ধর্মীয় উদ্দেশ্য)-এর জন্যে।” তিনি আরও বলেন, “এই সত্যের মধ্যে কোনও বিরোধিতা নেই যে বাবর কিংবা হুমায়ুন, আকবর, শাহজাহান ইত্যাদিরা এদেশীয় মুসলিমদের পূর্বপুরুষ নন। এদেশীয় মুসলমানরা খাজা গরীব নওয়াজ এবং সন্ত-সুফী, দরবেশদেরই বংশধর যাঁরা আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছেন। কেউ যদি মনে করেন তাঁরা বাবরের বংশধর তবে তাঁদের অবশ্যই কাবুলে চলে যাওয়া উচিত। যদিও আজকের দিনে সেখানেও বাবরের ধ্বংসাবশেষটুকুও দেখা

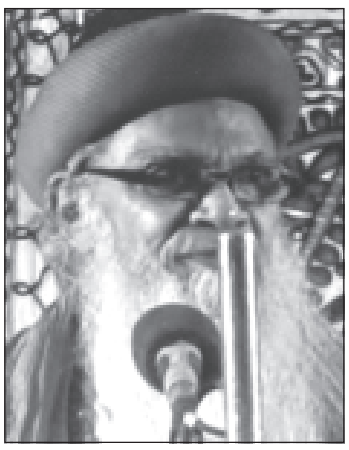

মহম্মদ হাসমি

দুষ্কর হয়ে উঠেছে।”

আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদ আর তাতে মুসলিমদের যোগ প্রসঙ্গে বলছেন, সৌদি আরব আর ইজরায়েল এরাই যত নষ্টের মূল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য— “সত্তর বছর আগেও বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ বলে তেমন কিছু ছিল না। ইসলাম ও হিন্দু দু’টো ধর্মই কিন্তু ৭০ বছর থেকে অনেকগুণ বেশি পুরোনো। আর হিন্দুত্ব তো একটি সনাতন ধর্ম। কিন্তু যদি সন্ত্রাসবাদের গোড়ায় যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে ইজরায়েল এবং সৌদি আরবের জন্ম হয়েছে সত্তর বছর পূর্বে যা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ উৎপত্তির সম-সাময়িক। আজকে অমুসলিমদের মধ্যে যাবতীয় সন্ত্রাসবাদ তৈরির হোতা ইজরায়েল এবং মুসলিম সন্ত্রাসবাদ-এর স্রষ্টা সৌদি আরব। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে সৌদি আরবের উত্থান-এর আগে বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না।”

সৌদি সরকার আসলে মুসলমানদের সঙ্গে বেইমানি করেছে বলেও ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তিনি। তাঁর কথায়, “৩৫০টি মসজিদ ভেঙেছে সৌদি আরব সরকার। এমনকী প্রফেট মহম্মদের স্ত্রী, কন্যা, জামাতা ও বাবা-মা-র সমস্ত মাজার (সমাধি)-গুলো অবধি ধ্বংস করা হয়েছে মক্কায়। এটা কি ধর্মীয় সন্ত্রাস ও মৌলবাদ নয়? যখন এই মাজারগুলোকে ভাঙা হচ্ছিল তখন কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেন উভয়েই নিশ্চুপ ছিল। কিন্তু ভারত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তখন কেউ ধারণা করতে পারেননি যে এই ধরনের ধর্মীয় মৌলবাদ রাজনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যেও আবির্ভূত হতে পারে।” পয়গম্বর মহম্মদকে অবশ্য এর

সরকারি অনুষ্ঠানের ব্যানার।

জন্য দোষী করছেন না তিনি। কারণ মিঞার মতে, এই অসহিষ্ণুতা মহম্মদের শিক্ষা নয়। এটা উগ্র মৌলবাদী চিন্তামাত্র। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, সৌদি আরবের মানুষ আসলে ভারতীয় মুসলিমদের ঠকাচ্ছে। তারা ভারতীয় ‘ধর্মপ্রাণ মুসলিম’দের জন্য তবলীগ-এ জামাত গঠন করেছে। একই ভাবে, কিছু শিক্ষিত মুসলিমদের জন্য তারা জামাত-এ-ইসলামি গঠন করেছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মুসলমানদের জন্য গঠন করেছে জমিয়েত উল-উলেমা-র মতো সংগঠন। চরমপন্থী মুসলিম ছাত্রদের জন্য গঠন করেছে সিমি (স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া)। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে জেহাদের একটা প্রবণতা রয়েছে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন যেমন হিজবুল মুজাহিদিন, লস্কর এ তৈবা, তালিবান, আল কায়দা ইত্যাদিতে। এইভাবে ভারতীয় মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভেদ এনে, তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী কাজ কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে।” এনিয়ে আমেরিকাকেই কাঠগড়ায় তুলছেন মিঞা। সৌদি আরব এবং ইজরায়েলকে ‘আমেরিকায় দুই হস্ত’ বলে বর্ণনা করে তাঁর মন্তব্য, আমেরিকা প্রথমে সৌদি আরবকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল এবং এখন তার টার্গেট ভারত। কিন্তু আমি নিশ্চিত আমেরিকার অসৎ উদ্দেশ্য ভারতে কখনওই সফল হবে না। যেহেতু এই ভূমি সন্ত ও আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের ভূমি।

‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদ’ এবং ‘মুসলিম সন্ত্রাসবাদ’— সন্ত্রাসবাদকে এই দু’প্রকারে বিভাজিত করার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে হাসমি মিঞার। কারণ তাঁর মনে হয়েছে,— “আপনি যদি সন্ত্রাসবাদের নাম দেন ‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদ’, তবে তার দায়ভার বর্তায় দেশের আশি কোটি হিন্দুর ওপর। আবার যদি আপনি এর নাম দেন ‘মুসলিম সন্ত্রাসবাদ’, তবে দেশের ২০ কোটি মুসলমানেরই ওপর তার দায়ভার বর্তায়। আমাদের আশু কর্তব্য সন্ত্রাসবাদীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করা। ভারতবর্ষে সন্ত্রাসের কোনও স্থান নেই। তবে এটা এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে যে আজমগঢ়, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মুম্বাই, ছত্তিশগড় এবং দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে ঠিক একই আদর্শবাদে বিশ্বাসী (পড়ুন উগ্র ইসলামিক মৌলবাদ) সন্ত্রাসবাদীরা গ্রেপ্তার হলো কেন? আমরা সবাই সেই মৌলবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে সচেতন রয়েছি। আমরা কিন্তু এ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকব না।”

হাসমির এহেন কথাবার্তায় এদেশের মুসলিমদের কতটা চৈতন্যোদয় হবে তা বলা মুশকিল। তবে দেশের রাজনৈতিক মহলে এনিয়ে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ হাসমি মিঞার বক্তব্য রাজনৈতিক ভাবে মুসলমান সমাজ ভোটবাক্সে প্রতিফলিত করলে সেটা মুসলিম-ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে রাজনীতি করা কোনও রাজনৈতিক দলের কাছেই আদৌ সুখকর হবে না। কারণ মিঞা দেশের প্রতিটি মুসলমানকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন “দেশের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।” হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দু’টি বিষয় এই মুহূর্তে সবচেয়ে স্পর্শকাতর— প্রথমত গো-হত্যা আর দ্বিতীয়ত রামমন্দির, সে সম্পর্কেও মুখ খুলেছেন ইসলামীয় শাস্ত্রের এই পন্ডিতটি। গো-হত্যা সম্পর্কে তাঁর অভিমত— “পয়গম্বর আমাদের সমস্ত সব রকমের ফল ও শাক-সব্জি খেতে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু সব পশুর মাংস খাবার অনুমতি আমাদের নেই। তবে গো-হত্যাকে আমরা কখনই প্রশ্রয় দিতে পারি না যেহেতু এটা হিন্দুদের হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করে। যদি স্ত্রী, সন্তান বা বন্ধুদের কথায় আমরা পরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টে ফেলতে পারি তাহলে প্রতিবেশীর কথা ভেবে খাদ্যাভ্যাস কেন পাল্টাতে পারব না? খাদ্য তো শুধু দেহের পুষ্টি-সাধনের জন্যই নয়, আমাদের প্রতিবেশী ধর্ম-কেও তার রক্ষা করা উচিত।” রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখন ভোটের সময় হয় তখনই কেবল বিতর্কটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মিঞার বক্তব্য—“এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে বিষয়টি (রামজন্মভূমি বিতর্ক) এখন খুব জটিল আকার ধারণ করেছে। যে কোনও মসজিদ প্রসঙ্গে ইসলাম যথেষ্ট উদার ও মুক্তমনা। আমরা বিশ্বাস করি গোটা পৃথিবীটাই আমাদের কাছে মসজিদ এবং সেজন্যই আমরা সর্বত্র নামাজ পড়তে পারি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সব ভূমিখণ্ডকেই মসজিদ মনে করে আমরা নমাজ পড়ব। যদি আমরা একসাথে বসি তবে যে কোনও সমস্যার নিশ্চয়ই সমাধান হবে। বুদ্ধিমান কিংবা পন্ডিত ব্যক্তি তখনই অশিক্ষিত হন যখন তিনি সময়ের দাবী মানতে না চান। আমাদের উচিত সেই চক্রান্তটা বোঝা যেটা আমাদের দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। নিজের দেশকে রক্ষা করা যে কোনও সচেতন কর্তব্যশীল নাগরিকের কর্ম। একজন সৎ এবং সু-নাগরিক হতে গেলে এই সংস্কারগুলো তার পরবর্তী প্রজন্ম, পরিবার, প্রতিবেশী, এলাকা, দেশ এবং এমনকী সারা বিশ্ব মাঝেও ছড়িয়ে দিতে হয়। যে সময় ও শক্তি আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই-এ ক্ষয় করছি, সেটা ভারতবর্ষের উন্নতির কাজে লাগানো যেতে পারে।”

সন্ন্যাসী-বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ডঃ সুকুমার মাইতি

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের তথা সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পাঁচ বছরের মধ্যে, ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত, কয়েকজন মহৎ-প্রাণ মানুষের আবির্ভাব হয়। প্রথমে জগদীশচন্দ্র বসু, তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং শেষে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ)। এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিকপাল ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা ধনবান ছিলেন। দেশে রসায়ন নিয়ে বি. এ. পড়াকালীন তিনি গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করে বি. এ. পরীক্ষার অনেক আগেই ইংলণ্ড পাড়ি দেন এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৭ সালে অজৈব রসায়নে ডক্টরেট (ডি এস সি) ডিগ্রী লাভের পর দেশে ফিরে আসেন। চাকুরীর জন্য বহু খানেক চেষ্টা করার পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তখন বাঙলায় একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই বিজ্ঞান অধ্যাপনার সুযোগ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের জন্য স্নাতকোত্তর বিভাগ ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাপনায় খ্যাতিলাভ করে তরুণ ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর কাছে পড়াশোনা করার জন্য উজ্জ্বল, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ছাত্রদের ভিড় হোত। তাদের নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি অজৈব রসায়নে, বিশেষ করে পারদ ধাতুর যৌগ নিয়ে, গবেষণা আরম্ভ করেন। অচিরেই তিনি মার্কিউরাস নাইট্রাইট নামক একটি নতুন যৌগ আবিষ্কার করে বিশ্বের রসায়নবিদদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই বিখ্যাত আবিষ্কার বাঙালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে একটি অবিস্মরণীয় কবিতায় লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল ঃ

"বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে
বাঙালী দিয়াছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু
গরমিলে মিলাইয়া।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রপ্রীতি আজও পর্যন্ত কিংবদন্তী হয়ে আছে। ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহ, ভালবাসা, তাদের মঙ্গলের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অধ্যাপক হিসাবে তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থাপন করে। অনেক দুঃস্থ ছাত্রকে তিনি নিজের কাছে, একই ঘরে রেখে, তাদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন করেছেন। তাঁর শিক্ষায়, গবেষণা-পরিচালনায় এবং স্নেহ-ভালোবাসার টানে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত বিজ্ঞান কলেজে রসায়নে পঠনপাঠন ও গবেষণায় একদল প্রতিভাবান ছাত্র আকৃষ্ট হন। তাদের মধ্যে নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বীরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখেরা ভারতে রসায়ন বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আবার তাঁর সেইসব কৃতী ছাত্র ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার সূত্রপাত করে খ্যাতিমান হয়েছেন। এই জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে ভারতে রসায়ন শিক্ষা ও গবেষণার জনক বলা হয়।

তখনকার দিনে বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য কোন ছাত্রবৃত্তি ছিল না। আচার্যদেব বিজ্ঞান গবেষণায় ছাত্রবৃত্তি দেবার উদ্যোগী হন। অধ্যাপনার শেষ পনেরো বছর তিনি মাসে মাত্র এক টাকা নিয়ে বেতনের সব অংশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন গবেষণায় কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি প্রবর্তনের জন্য। আর কোনও অধ্যাপক কি এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নিজের অধ্যাপনার বিষয়ে চর্চা ও গবেষণার প্রসার এবং উন্নতির জন্য? আসলে তাঁর জীবন ছিল উপনিষদের ঋষিদের মন্ত্রে নিবেদিত ঃ

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা
মা গৃধঃ কস্যচিৎ ধনম্।"

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনযাত্রা সন্ন্যাসীর মতো সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং অনাসক্ত ছিল। তিনি বেশভূষায়, আহারে, জীবনযাপনে, খাঁটি বাঙালী ছিলেন। ধনী ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর নিজের চাহিদা

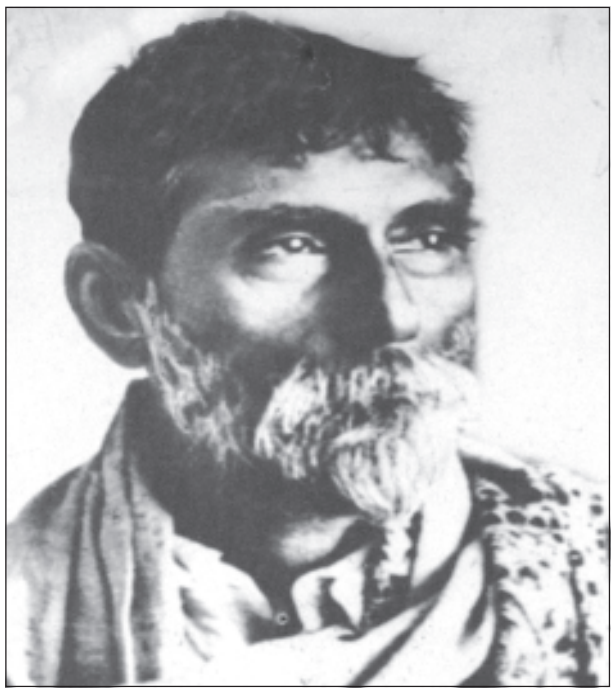

খুবই কম ছিল এবং তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে খদ্দরের ধুতি চাদর পরতেন। সে যুগের একজন বিলেত ফেরৎ উচ্চ শিক্ষিত খ্যাতিমান বিজ্ঞানের অধ্যাপক সাহেবী পোষাক বর্জন করে সাধারণ বাঙালীর পোষাকে সজ্জিত থাকতেন— এ কথা চিন্তা করা যায় না। এজন্য মহামতি গোখলে তাঁকে 'সন্ন্যাসী বিজ্ঞানী' বলে অভিহিত করেন।

অন্তরে সন্ন্যাসী ও দেশপ্রেমিক, বাইরে বিজ্ঞান-সাধক। তাঁর দেশপ্রেম কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছিল। দেশের দুর্গতির সঙ্কটে— বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়— তিনি নিজেকে ল্যাবরেটরীর চার দেওয়ালের বিজ্ঞান-গবেষণায় ধ্যান-নিমগ্ন রাখেননি, ছুটে গেছেন ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে ত্রাণ-সামগ্রী সহ বন্যার্ত ও ক্ষুধার্তদের পাশে সেবার জন্য। নিজে দুর্বল ও পেটের অসুখের রোগী হয়েও আর্তের ও পীড়িতদের সেবায় কোনদিন পরাঙ্মুখ হননি। বিজ্ঞানী অধ্যাপকের এই সেবাব্রতী মূর্তি আচার্যদেবকে বিজ্ঞানীর উচ্চ আসনের থেকে মহৎপ্রাণের সমুন্নত উজ্জ্বল শ্রদ্ধার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর এই অক্ষম কীর্তি আমাদের যুগ যুগ ধরে কর্তব্যকর্মে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রফুল্লচন্দ্রের দেশপ্রেম ও স্বাভিমান তাঁকে মনুষ্যত্বের আর এক শীর্ষদেশে স্থাপিত করেছে। ইংল্যাণ্ডে ছাত্রাবস্থায় তিনি একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর স্বদেশপ্রীতি এবং নির্ভীকতার পরিচয় দেন। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতে বৃটিশ শাসকদের তীব্র সমালোচনা করেন। সেজন্য দেশে ফিরে তাঁকে সরকারী চাকুরী পেতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-গরিমায় তিনি অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন।

বিশ্বের দরবারে হিন্দুদের রসায়নে কি অবদান ছিল সে নিয়ে তিনি দীর্ঘ পনেরো বছরের অক্লান্ত গবেষণায় বহু সংস্কৃত বই, ইংরেজী বই ও দলিল, তিববতী পাণ্ডুলিপি পড়াশোনা করে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ— History of Hindu Chemistry, দু'খণ্ডে প্রকাশ করেন। এটি তাঁর একটি ঐতিহাসিক কীর্তি। বিজ্ঞানের এই ইতিহাস সমগ্র ভারতবাসীকে প্রাচীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের উজ্জ্বলময় অবদানের জন্য গর্বিত ও গৌরবান্বিত করে। এই প্রামাণ্য দলিল সাক্ষ্য দেয় যে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় যখন বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত পর্যন্ত হয়নি, মানব সভ্যতার সেই ঊষাকালে ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় শীর্ষদেশে ছিল। শুধু মধ্যযুগে— মোগলদের সময় থেকে এদেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে পর্যন্ত আমাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চা অবহেলিত হয়ে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা শুরু করে আমাদের প্রচীন বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন। প্রফুল্লচন্দ্র প্রচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার গৌরবময় ঐতিহ্যকে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করে শুধু আমাদের গর্ববোধ জাগ্রত করেননি, তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গে গবেষণায় প্রায় দু'শ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়ে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার আধুনিক ধারাকে পুষ্ট ও সজীব করে।

গবেষণাপত্রগুলি যাতে দেশে প্রকাশিত হয় এবং আধুনিক রসায়ন চর্চার উন্নয়ন অব্যাহত থাকে, সেজন্য তিনি আর একটি অমর কীর্তি গড়ে তুলেছেন। তিনি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং সোসাইটির জার্নাল, জার্নাল অব ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, স্থাপন করেন। তিনিই ওই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ সাল থেকে এই জার্নাল রসায়নের বিভিন্ন বিভাগের গবেষণাপত্র প্রকাশ করে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করছে।

দেশের আর্থিক উন্নতি ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর অদম্য এবং অবিশ্বাস্য প্রয়াস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের— আমার দৃষ্টিতে, সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। শিক্ষিত বাঙালীর ছাপোষা কেরাণী হওয়া তিনি সহ্য করতে পারতেন না। নিজের বুদ্ধি ও শিক্ষার বলে, উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ে বাঙালী তরুণদল কিছু গড়ে তুলুক, অপরের প্রতিষ্ঠানে অধীনস্থ কেরানীসুলভ হীনমন্যতাকে ঝেড়ে ফেলে নিজের গড়া প্রতিষ্ঠানে মাথা উঁচু করে জীবনযাত্রা চালাক—এটাই তিনি সর্বদা সর্বাবস্থায় কামনা করতেন। এই নিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন বলার চেয়ে কাজ দেখানো অনেক বেশি কার্যকরী। তাদের সামনে আদর্শ তুলে ধরার জন্য নিজেই উদ্যোগী হয়ে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে অধ্যবসায়কে পাথেয় করে বাঙালীর নিজস্ব শিল্প-কারখানা, বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস স্থাপন করেন। এই কারখানায় তিনি দেশীয় গাছ-গাছড়া ও কাঁচামাল থেকে নিরাপদ ও কার্যকরী ওষুধপত্র, প্রসাধনী দ্রব্য প্রভৃতি তৈরি করেন। আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ভেষজ তৈরির উদাহরণ ছিল। কেবলমাত্র অর্ধশিক্ষিত একদল কবিরাজ সেই পদ্ধতিতে ভেষজ তৈরি করে চিকিৎসা করতেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে উন্নত প্রথায় ভেষজ তৈরি করার মতো শিক্ষা ও শিক্ষণ তাঁদের ছিল না। তাই কবিরাজী ওষুধ ও চিকিৎসা বিদেশী অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার তুলনায় অ্যালকেমির স্তরে ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করে ওষুধপত্র তৈরি করার পথ দেখালেন। এই বিষয়ে তিনি পথিকৃৎ। রসায়নকে ভিত্তি করে তিনি সফল, অভিনব এবং আধুনিক রাসায়নিক একটি শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুললেন। ভারতবর্ষে এটি একটি অনন্যসাধারণ শিল্প-প্রচেষ্টা।

একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে, যিনি দেশের একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও উদ্যোগে রাসায়নিক কারখানা প্রতিষ্ঠা করা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিদেশী কারখানায় কৃত্রিম রাসায়নিককে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে ভেষজ, প্রসাধনী প্রভৃতি ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র সেই পথ অনুসরণ না করে দেশীয় প্রাকৃতিক কাঁচামাল— গাছ-গাছড়া ইত্যাদি থেকে ওষুধ ও প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদন করেন। তাঁর জন্মের দেড়শ' বছর পরে, সারা বিশ্ব কৃত্রিম রাসায়নিক কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত ভেষজ, প্রসাধনী প্রভৃতি ভোগ্যপণ্য ব্যবহারে অনীহা দেখিয়েছে। কারণ, কৃত্রিম পেট্রো-রাসায়নিক থেকে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিরাপদ এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন নয়। তাই প্রাকৃতিক কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত ভেষজ এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্য নিরাপদ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হওয়ায় এগুলির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানির তৈরি ভেষজ এবং অন্যান্য পণ্য শুধু নিরাপদ নয়, গুণমানেও অন্য পণ্যগুলির চেয়ে উৎকৃষ্টতর।

আচার্য জগদীশচন্দ্র 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে এদেশে উচ্চ বিজ্ঞান গবেষণায় যে বিরল এবং অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানী স্থাপনের দ্বারা অনুরূপ নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। এই দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে তবু একটু তফাৎ আছে। জগদীশচন্দ্র তাঁর নিজের গবেষণার বিষয়ে গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। আচার্য রায় রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন, ইঞ্জিনীয়ার বা প্রযুক্তিবিদ ছিলেন না। বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা তৈরি এবং নিয়মিত পণ্য উৎপাদন বিজ্ঞানীর পক্ষে সহজ কাজ নয়, কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার বা প্রযুক্তিবিদের কাজ। তিনি রসায়ন বিজ্ঞানী হয়ে এই অসাধ্য সাধন করেছেন। শুধু পণ্য উৎপাদন নয়, পণ্যের গুণমান বজায় রাখা, পণ্যের লাভজনক বিপনন করা অধ্যাপকের আয়ত্বের বাইরে।

এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলে মনে হবে প্রফুল্লচন্দ্র একাজেও অসাধ্য সাধন করেছেন। যাঁরা শিল্পোদ্যোগী তাঁরা আচার্যদেবের এই অসামান্য কীর্তির কথা স্মরণ করে বিস্ময়াবিষ্ট এবং শ্রদ্ধাবনত হবেন। এদেশের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর অপরিহার্যতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেন এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণও স্থাপন করেন।

(লেখক খড়্গপুর আই আই টি-র মেটিরিয়্যাল সায়েন্স বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক)।

অবাঞ্ছিত বিতর্কের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত গ্রন্থ
‘হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি’

দেবীপ্রসাদ রায়

জ্বকিংবদন্তী-রসায়ন-বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মের সার্ধশতবর্ষ স্মরণে তাঁর প্রণীত বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ ‘হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি’র উল্লেখ ও আলোচনা বিশেষভাবে কাঙ্ক্ষিত, তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনিবার্য। কিন্তু ‘হিন্দু কেমিস্ট্রি’ শিরোনামটি নিয়ে জল ঘোলা করার প্রচেষ্টা চলছে কোনও কোনও মহল থেকে। বিজ্ঞানীর জন্মের শতবর্ষ অনুষ্ঠানের সময়েও এই অপপ্রয়াস এবং তার মাধ্যমে সর্বত্যাগী দেশব্রতী এবং বিরল দৃষ্টান্ত। এক বিজ্ঞানী ও আদর্শ শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্রকে হেয় করার প্রয়াস হয়েছিল। উদ্দেশ্যমূলক এই বিভ্রান্তিকর আচরণের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মকে সজাগ এবং সাবধান করার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।ব

হিন্দু শব্দটি কোথাও থাকলেই তা বর্জনীয় এবং সেটাই আগমার্কা সেকুলার ও প্রগতিশীল কর্ম বলে চিহ্নিত হওয়ার একমাত্র উপায়—এরকম একটা ধারণা পরিকল্পিতভাবে তৈরী করেছে বিদেশী ভাবধারায় সৃষ্ট এবং পুষ্ট একশ্রেণীর বুদ্ধি জীবী। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই ধারণার সংক্রমণ ঘটাতে তৎপর হয়েছে এই বুদ্ধি জীবীরা। এটা নতুন নয়। বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের বক্তব্য উপস্থাপনে চিকাগো ধর্মমহাসভার সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকা ওড়ালেন। তাঁকে ‘সাইক্লোনিক হিন্দু মঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া’ বলে আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় প্রশংসা করা হলো। দেশে ফিরে বিবেকানন্দ ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ নামে সংস্থা গড়ে তুললেন আর্ত মানুষের সেবার জন্য—শিক্ষার জন্য। বিবেকানন্দের নেতৃত্বেই ভারতে এক সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান সম্ভব হয়েছিল। এই বিবেকানন্দকে ওই বুদ্ধি জীবীরা হিন্দু সংকীর্ণতাবাদের প্রতীক বলে মূল্যায়ণ করেন। বিবেকানন্দের ওই প্রতিষ্ঠানের আদর্শে স্থাপিত অনুরূপ অন্য প্রতিষ্ঠানের গায়েও সুযোগ পেলেই কাঁটা ফোটান ওই প্রগতিশীলরা। দেশের মহৎ এবং বরেণ্য চরিত্রগুলিকে কলঙ্কায়নের এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন এই প্রগতিশীল বুদ্ধি জীবীরা। প্রফুল্লচন্দ্র এই কলঙ্কায়ন-ঐতিহ্যেরই শিকার।

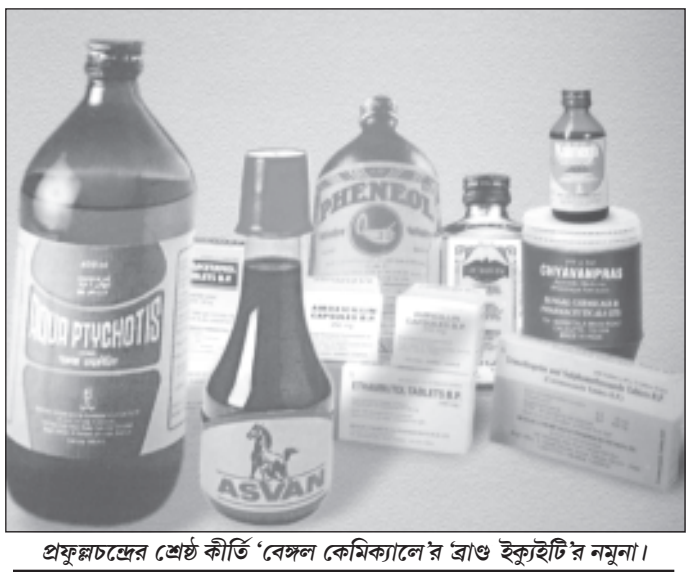

প্রফুল্লচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘বেঙ্গল কেমিক্যালে’র ‘ব্রাণ্ড ইক্যুইটি’র নমুনা।

কিছুদিন আগেই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সার্ধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তীর সময়ও দেখেছি কীভাবে এই বুদ্ধি জীবীরা দেশের বরেণ্য মনীষীদের মধ্যে তাঁদের প্রগতিশীলতার মাপকাঠিতে এক বিভাজন প্রক্রিয়া চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁদের মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিককে হতে হবে নাস্তিক, শ্রেণীসচেতন এবং সেকুলারিজম-এর প্রবক্তা হিসেবে ‘হিন্দু’ শব্দটির প্রচণ্ড বিরোধী ও তার কারণেই প্রচণ্ডভাবে দেব-দেবী এবং মঠ-মন্দিরবিরোধী। এখন জগদীশচন্দ্র বসু সেরকমভাবে নাস্তিকতা এবং হিন্দুত্ব-বিরোধিতা প্রকাশ না করায় তাঁর রচনা থেকে কিছু বাছাই করে তাঁকে দেব-দেবী বিরোধী, মন্দির বিরোধী প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে(জ্ঞানবিচিত্রা, উৎসব সংখ্যা, ২০০৮) । অপ্রয়োজনীয়ভাবে এবং কোনও প্ররোচনা না থাকা সত্ত্বেও, জগদীশচন্দ্র থেকে উদ্ধৃতি, “অজ্ঞ হিন্দু রমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব”— অবলম্বন করে জনৈক লেখক লিখছেন ‘...জগদীশচন্দ্র ইচ্ছা করেই কোনও নাম করেননি কিন্তু আমাদের কাছেই সর্বপরিচিত একটি উদাহরণ হচ্ছে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠা করা দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির।” অর্থাৎ রাণী রাসমণি যিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহস নিয়ে ইংরেজদের মোকাবিলা করেছেন, যাঁর অভিভাবকত্বে নতুন ভারতের প্রাণস্পন্দন, মন্দির দক্ষিণেশ্বরে শুরু হয়েছিল—সেই তিনিই অজ্ঞ হিন্দু রমণী! —আরও লিখেছেন ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’কে তিনি ‘জ্ঞানের গৃহ বা সমুদ্র’ বলেই ধরেছিলেন। তা সাধারণ মানুষ কি বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে দুর্গা বা কালী বা শিবমন্দির ভাবতো? পণ্ডিত লেখক আরও লিখেছেন ‘ব্রহ্ম’ নামে (হিন্দুধর্মে) এক রহস্যময় জীবের সৃষ্টি করা হয়েছিল যাকে জানার জন্য চেষ্টা করবে ও আরাধনা করার ‘ব্রাহ্মণ’ নামে বিশেষ কিছু মানুষ...ইত্যাদি ইত্যাদি— ব্রহ্ম নামে এক বিশেষ জীব! কী সুগভীর পাণ্ডিত্য! এ সবের উত্তর দেওয়া সময় নষ্ট মাত্র কিন্তু তরুণ মনকে বিভ্রান্ত করতে পারে বলেই কিছু উত্তর দেওয়া। জগদীশচন্দ্র বসুর স্বহস্তলিখিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উৎসর্গ-পত্রটি লক্ষ্য করুন (চিত্র দ্রষ্টব্য)। ‘ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞানমন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম।’ এই ধরনের প্রগতিশীলরা এখন প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ে পড়েছেন, তাঁর সুবিদিত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসিত গ্রন্থ ‘হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি’ নামটি নিয়ে। হিন্দু কেমিস্ট্রি ব’লে কিছু হয় কি? বিজ্ঞান চর্চা কি জাতি গোষ্ঠী বর্ণের অধীন? তাৎক্ষণিক উত্তর ‘বিজ্ঞান বা সত্য-র কোনও ধর্ম বর্ণ...নেই।’ তাহলে প্রশ্ন আসে প্রফুল্লচন্দ্র কি ধর্মান্ধ ছিলেন— তার জন্যই ‘হিন্দু কেমিস্ট্রি’ নাম ব্যবহার করেছিলেন? তাঁকে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট প্রতিপন্ন করার ইঙ্গিতবহ এই প্রশ্নগুলি। আসলে কিন্তু একেবারেই অবান্তর এবং দুরভিসন্ধিমূলক। কারণ প্রফুল্লচন্দ্র বিষয়ক আমার প্রবন্ধে গ্রন্থের এই নামকরণের পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার জানাই প্রফুল্লচন্দ্রের রচনা থেকে...“১৮৯৭ খৃস্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানের তদানীন্তন আচার্য ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে বার্থেলোর সাথে আমার বার্তালাপ হয়। রসায়ন বিজ্ঞানের অতীত ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমাদের উভয়েরই এই যোগাযোগ আলোচনার ধারায় একটি নতুন গতি সঞ্চার করিল। বার্থেলো ছিলেন প্রাচীন ইউরোপের রসায়নচর্চার ইতিহাস সম্বন্ধে অদ্বিতীয় পণ্ডিত...এক পত্রে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, রসায়ন বিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুগণের অবদান কতটুকু? এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেও আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার এই অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে আমি তাঁহাকে হিন্দু এ্যালকেমি ও তন্ত্রশাস্ত্রের একখানি পুস্তিকা উপহার দিলাম। পরে তিনি তাঁহার ‘রসায়ন শাস্ত্রের-ইতিহাস’— তিন খণ্ডের গ্রন্থ উপহার পাঠাইলেন।” এর পর তিনি নিজেই হিন্দুদের আদান নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার শেষে “History of Hindu Chemistry Vol-I” প্রকাশ করলেন।

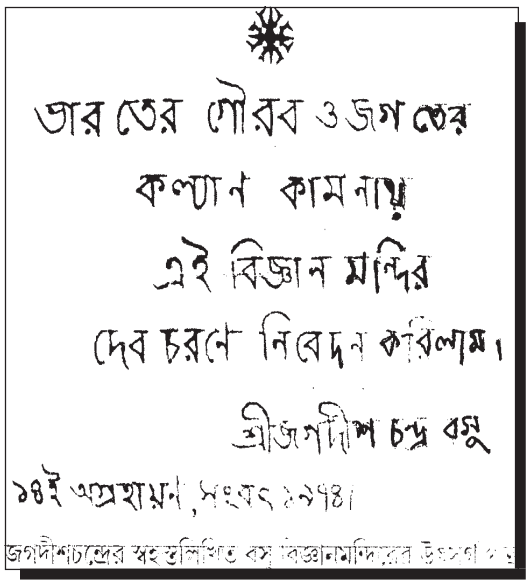
ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেব চরণে নিবেদন করিলাম।
শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু
১৪ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৭৪।
জগদীশচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উৎসর্গ-পত্র।

বার্থেলোর ‘হিন্দুদের অবদান’ জিজ্ঞাসার প্রামাণিক উত্তরেই এই গ্রন্থ—‘হিন্দু কেমিস্ট্রি’ নামকরণ তাই প্রাসঙ্গিক, যুক্তি সঙ্গত। বার্থেলো কেন হিন্দু-অবদান জানাতে চাইলেন? কারণ সেই সময় ভারত বা ইন্ডিয়ার চাইতে বিশ্বে পরিচিত ছিল ‘হিন্দুস্থান’— তার অধিবাসী হিন্দুদের অবদানই জ্ঞাতব্য ছিল। সমকালীন বিশ্বে কিন্তু কেউই ‘হিন্দু’ নাম নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেননি, ১৯০৩ সালে মঁসিয়ে বার্থেলো Journaedes Savaut নামক পত্রিকায় প্রফুল্লচন্দ্রের গ্রন্থ নিয়ে দীর্ঘ ১৫ পৃষ্ঠা-ব্যাপী আলোচনা করেন। কী অসম্ভব গুরুত্ব পেয়েছিল গ্রন্থটি! ১৯১২ খৃস্টাব্দে ডারহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফুল্লচন্দ্রকে ডি এস সি উপাধি প্রদানের সময় বলেন...কিন্তু তাঁর প্রাধানতম কৃতিত্ব ওই গ্রন্থ...এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে ইহার সিদ্ধান্তগুলিতে কোনও অস্পষ্টতা নাই এবং শেষ কথা বলা হইয়াছে— “বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সান্টে আরহেনিয়াস তাঁর Chemistry in Modern Life áèËLš History of Hindu Chemistry থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই সব বিজ্ঞানীদের মনে ‘হিন্দু’ শিরোনাম নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। হয়তো তাঁরা ‘প্রগতিশীল’ ছিলেন না! বিজ্ঞানীও নয়। যেহেতু প্রফুল্লচন্দ্র ‘হিন্দুত্ববাদী, সাম্প্রদায়িক’ অতএব তাঁর অন্য কৃতিত্বও খর্ব করা দরকার। কোনও কোনও প্রগতিশীল গবেষক বলতে থাকেন প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্কৃত মারকিউরাস নাইট্রাইট নাকি আদৌ তৈরী হয়নি—তৈরী করা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হলুদবর্ণের লবণ মারকিউরাস নাইট্রাইট-এর খবর প্রথম সংক্ষিপ্ত আকারে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। পরে তা পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় দ্ব.ট্রট্র-তে [Mercurous Nitrite-its preparation and properties-Zeitschrift fur Anorganische Chemic, Germany)। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ময়সন তাঁর রসায়নের এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থে এই মারকিউরাস নাইট্রাইট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমাদের এখানে যে প্রগতিশীল রসায়নবিদ এটি করা যায় না বলে প্রফুল্লচন্দ্রকে ‘মিথ্যাবাদী’ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন তিনি দ্বট্টট্র বা ওই এনসাইক্লোপিডিয়াকে জানিয়েছেন? তিনি নিজে করতে পারেননি বলে প্রফুল্লচন্দ্রকে দোষারোপ! সত্যিকারের একজন বিজ্ঞানীর কি করা উচিৎ ছিল সে সম্পর্কে একটি উদাহরণ রাখতে পারি।

সত্যেন বসু প্রস্তাবিত ফোটন স্পিনকে আইনস্টাইন স্বীকার না করলেও সি. ভি. রমন এবং ভগবন্তম্ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্পিন অস্তিত্বের ইতিবাচক ফলাফল পান। এটিকে চার্লস মনোবাক এর দ্বি-পরমাণু অনুর জন্য তত্ত্বের সঙ্গে মেলাতে পারেননি। পরীক্ষালব্ধ ফল নিয়ে রমন নিশ্চিত ছিলেন এবং উক্ত তত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ বলে সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী নীলস্ বোর-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি, প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দু অবদান অর্থে ভারতীয় অবদানই বুঝিয়েছিলেন। না হলে বৌদ্ধ পণ্ডিত রসায়নবিদ নাগার্জুন তাঁর গ্রন্থে আসবে কেন? তাই ‘হিন্দু রসায়ন’ নিয়ে হৈ-চৈ করা একেবারে অর্থহীন।

কিন্তু সত্যিই কি হিন্দু বিজ্ঞান বলার অন্য কোনও তাৎপর্য নেই? এটি প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনার বাইরে থাকলেও আমরা সেটা নিয়ে চিন্তা করতেই পারি। পরম সত্য সম্বন্ধে হিন্দু তথা ভারতীয় দর্শন অন্যান্য দর্শন থেকে আলাদা পরম সত্য এক অখণ্ড। সেই সত্য অর্জনের পথ বিদ্যার দুটি অংশ, অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। জড় বা আপেক্ষিক জগতের জন্য অপরা বিদ্যা অর্থাৎ যার দ্বারা মৃত্যুকে রোধ করার প্রচেষ্টা হয় আর পরাবিদ্যা—যার দ্বারা পরমসত্য বা অমৃত্ব লাভ করা যায়। ‘অবিদ্যয়া মৃত্যুং-তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমাষ্নুতে-মৃত্যুকে রোধ করার জন্য অবিদ্যা বা জড়বিজ্ঞান আর অমৃত বা পরম সত্যকে লাভ করার জন্য পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান। পরম সত্য হলো এক সর্বব্যাপী চেতনা যা থেকে সমস্ত জড়জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং যাতে তার লয়— সেই সর্বব্যাপী - চৈতন্য বা ‘স্তব্ধস্তব্ধস্তব্ধস্তব্ধব্দব্দব্দব্দ’-ই হলো ‘ব্রহ্ম’ নির্গুণ ব্রহ্ম— প্রগতিশীলদের ধারণামথিত কোনও ‘বিশেষ জীব’ নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ব্রহ্মর কথাই বলা হয়েছে—

যতোবাইমানিভূতানি জায়ন্তে
যেন যাতানি জীবন্তি,
যৎপ্রযন্তভিমংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্য
তদ ব্রহ্মেতি।।

আধুনিক পদার্থবিদ্যার প্রাপ্তিও তাই। জড়জগত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর উৎপত্তির জন্য দায়ী মহাকর্ষ ক্ষেত্র, তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্র, ক্ষীণ ও তীব্র নিউক্লীয় ক্ষেত্র যারা শেষ অবধি এক এবং অভিন্ন ক্ষেত্রে লীন হয়ে থাকে। সত্ত্ব-রজ-তম-লীন হয়ে থাকা চৈতন্যর মতো, এক সাম্যাবস্থা। এই সাম্যাবস্থা কোনও ভাবে বিঘ্নিত হলেই নির্গুণব্রহ্ম-সগুণ ব্রহ্মেপরিণত হয় এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। অখণ্ড অভিন্ন ক্ষেত্রে প্ল্যাংক দৈর্ঘ্যর বস্তু সৃষ্টির মাধ্যমে। হিন্দু উপনিষদীয়

(এরপর ১৫ পাতায়)

শৈশবকে হত্যা

আমরা শিশুদের শৈশবকে হত্যা করছি। একটি শিশুর বয়স দু'বছর হতে না হতেই অভিভাবকরা বিশেষ করে পিতামাতা অস্থির হয়ে পড়েন তাদের একটা ভালো নার্সারি স্কুলে ভর্তি করতে। পরে যাতে সে একটা নামী-দামী ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হতে পারে। আমরা ইঁদুর-দৌড়ে যোগ দিচ্ছি। শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ভাবছি না যে শিশু তার শৈশবকে হারাচ্ছে।

যখন সে আপন মনে ছুটবে, খেলবে, হয়তো বা দুষ্টুমিও করবে, সেই সময় তাকে জোর করে ঘুম থেকে তুলে, প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়ে, তার মা তাকে নিয়ে স্কুলে ছুটছেন। দু'তিন ঘণ্টায় স্কুলে নামমাত্র পড়া ও কিছু বাচ্চার সাহচর্য পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার আপন মনে সব কিছু করার মনটাকে আমরা হত্যা করছি। এই শৈশব থেকেই তার কল্পনাশক্তির, তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে আমরা রুদ্ধ করছি। সে শুনতে পাচ্ছে না ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র, রাজকন্যার গল্প। সে হয়তো কোনওদিন পড়বার সুযোগ পাবে না, "মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।" তার কল্পনা করার স্বাভাবিক ইচ্ছেটাকেই আমরা মেরে ফেলেছি।

তারপর শিশু ক্লাস ওয়ানে উঠলেই শুরু হচ্ছে টিউটরের ধাক্কা। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচ/ছয়টি টিউটরের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে যখন বাড়ি ফেরে, তার পড়বার ক্ষমতা থাকে না। রাতে খেয়ে আবার রাত ২।৩টা পর্যন্ত পড়ে। এর ফলে শরীর নষ্ট হয়। 'আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ'—প্রবচনটি তার অজানাই থেকে যায়। সারাদিন সে একটা চাপের মধ্যেই চলতে থাকে। মেধা থাকলে সে হয়তো পরপর ভাল রেজাল্ট করে অনেক অনেক অর্থ রোজগারের পেছনে ছোটে। অর্থ আসে। সাথে নিয়ে আসতে পারে আনুষঙ্গিক অনর্থ। প্রচুর অর্থের লোভে বিদেশে ছোটে। দেশ হারায় একটি মেধার কাছে প্রাপ্তব্য প্রতিদান। ওই ব্যক্তি হারায় ভারতীয় পরম্পরার সাথে তার নাড়ীর টান।

সরকার থেকে যে অর্থ ওই ব্যক্তির শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় (সুদ সহ হিসাব করলে এম এস সি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রত্যেক ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ টাকা হবে) তার অপচয় হয়, কারণ দেশ তার কোনও সুফল পায় না।

রুশো বলেছেন, শিশুর সাত বছর বয়স পর্যন্ত তাকে আপন মনে চলতে দিতে হবে। তবে সে যাতে সুশৃঙ্খল ও ভাল হয় তার দিকে নজর দিতে হবে। চাণক্য বলেছেন, 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষানি'.... যেখানে শিশুর উপর কোনও Compulsion থাকবে না।

সুধীদের, বিশেষ করে শিশু শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই শৈশব হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সরকারের কাছে আবেদন করুন, পরে আন্দোলন করুন, সরকার যেন আইন করে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর পাঁচ বছর না হোক অন্ততপক্ষে চার বছর পূর্ণ হবার আগে ভর্তি বন্ধ করার আদেশ দেন।

—হৃষীকেশ কর, বিধাননগর, কলকাতা।

বেতন বৃদ্ধির রাজনীতি

গত ৩০.৮.১০ তারিখের স্বস্তিকার সম্পাদকীয় কলমে 'সাংসদদের বেতন বৃদ্ধি' সম্পর্কে মতামত পড়লাম। 'রাজনীতিতে পেশাদারিত্ব আসুক'— এই মন্তব্যের সঙ্গে এক হতে পারছি না। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এমন কতগুলি যোগ্যতার উপর গড়ে ওঠা উচিত যা দেখে দেশের আপামর জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী অথবা গরীব, সকলেই দেশাত্মবোধ, মানবতাবোধ, সমাজবোধ ও একাত্মতাবোধে উদ্দীপিত হয়। রাজনীতিতে পেশাদারিত্ব এলে মানুষ তাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবেই না। যে দেশের অতি গরীব, গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, (জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ) মানুষগুলো দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য, ছোট্ট একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরির জন্য, ছেলেমেয়েদের একটু শিক্ষার জন্য সারাদিন অমানুষিক ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তাদেরই উন্নতির জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (সাংসদরা) নিজেদের জন্য মাসিক ২-৩ লক্ষ টাকা অর্থের প্রয়োজন মনে করেন— এটা ভারতমায়ের দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই নয়।

'নির্বাচনী লড়াই-এ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, ব্যক্তিগত না হলেও সংগঠনগত হিসাবে তো বটেই'— কঠিন বাস্তব সত্য, আর এর মধ্যেই রয়েছে সমস্ত দুর্নীতির মূল উৎস। এই নির্বাচনী লড়াই-এ সংগঠিত অর্থের শুদ্ধ তা কতখানি আছে তা বিশ্লেষণের বিষয়, সারা পৃথিবীতে দুর্নীতিতে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে এটাও সকলেই জানেন। এর থেকে মুক্তির পথ রাজনীতিতে পেশাদারিত্ব নয়, রাজনীতিবিদ ও রাজপ্রতিনিধি, সাংসদ ও সব স্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের চাই সরলজীবন, সমস্তরকম কষ্ট ও দুঃখকে বরণ করার মত মানসিক ক্ষমতা, যা হিন্দু জীবনদর্শনে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। শুধু তাই নয় এই দেশেতেই জন্মেছেন রাজনীতিবিদ চাণক্য। তাঁর জীবনচরিতই হওয়া উচিত বর্তমান রাজনীতিবিদদের অনুকরণীয়। ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন ঐতিহ্যময় দেশে ইউরোপীয় সভ্যতার বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে প্রকৃত রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না। যে সাংসদরা নিজেদের সঙ্গে আমলাদের আয়ের তুলনা করেন, সীমাহীন বেতন বৃদ্ধির যুক্তি খাড়া করেন বা যুক্তির পক্ষে মৌনতা অবলম্বন করেন, বা প্রতিবাদ করেও নিঃশব্দে তা বর্ধিত বেতন গ্রহণ করেন। তাঁরা ভারত জনমানসে শ্রদ্ধার আসনে কখনই আসীন হবেন না।

সেক্ষেত্রে রাজনীতি না করে একজন আমলা হউন, একজন শিল্পপতি হউন, একজন বেতনভুক কর্মচারী হউন— তাঁদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, রাজনীতিতে পেশাদারিত্বকে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে রাজনীতিবিদ হতে গেলে তার জন্য ডিগ্রী কোর্স চালু হোক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। যে যেমন ডিগ্রী অর্জন করবেন তারা সেই স্তর মত রাজনীতির পদ অধিকার করুন। তাহলে ভোটের প্রয়োজনে রায়ের প্রশ্ন থাকবে না। স্বাধীনতার আন্দোলনের যুগে যে সমস্ত বীর সৈনিক ভারতমায়ের চরণে সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন তাঁদের আত্মারা অবাক বিস্ময়ে নিজেদের প্রশ্ন করুক এটাই কি আমরা চেয়েছিলাম?

—আশুতোষ দে, হরিপাল, হুগলী।

প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণা প্রতাপ

গত ২০.০১.১০১০-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় মহারাণা প্রতাপ সম্বন্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর কথা লেখা হয়েছে। 'রাণাপ্রতাপ'কে সামনে রেখে 'রাজপুত জোট তৈরীর প্রয়াস' বিষয় লেখা হয়েছে যে, 'হলদিঘাটের যুদ্ধে মোগলদের হাতে নিহত রাণার স্মরণে রাজস্থানে নানা অনুষ্ঠান হয় ঠিকই'।

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথাই হলো যে মহারাণা প্রতাপ মোগলদের হাতে নিহত হননি। উদয়পুরের বাইরে পেশোলা হ্রদ—এই হ্রদের পাশে কখনও কখনও মহারাণা প্রতাপ তাঁর সর্দারদের সঙ্গে নিয়ে থাকতেন। এইখানে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ১৯ জানুয়ারি ১৫৯৭ সালে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা আছে। তা হলো—

Early in January 1597 he pulled a muscle while aiming an arrow in a tiger hunt or the outskirts of his capital Chawland. There this lion of a hero who had overstrained himself in saving Hinduism against brutal Muslim Assaults died on January 19,1597. He was cremated at Chawland where a modest stone canopy shelters the sacred spot.

[Courtsey : Mother India' October, 1966]

আনন্দবাজার পত্রিকাকে আমি একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছি এই লেখার জন্য।

আরবের পেট্রোডলারে পুষ্ট, জাতীয়তাবিরোধী 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে ধিক্কার জানিয়ে, আমার প্রতিবাদে সকলে সামিল হোন এই অনুরোধ নিয়ে চিঠি শেষ করছি।

—পি. কে. ঘোষ, বিধাননগর, কলকাতা।

ভাষা কমিশন

'সংস্কৃত ভাষা' শীর্ষক পত্রে (স্বস্তিকা, ৯.৮.১০) বারিদবরণ গুহ বলেছেন—দেশভাগের পর জওহরলাল কোন্ ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে তা নিয়ে ভাষাবিদ ডঃ সুকুমার সেনকে সভাপতি করে একটি ভাষা কমিশন বসিয়েছিলেন। ভাষা কমিশনে দীর্ঘ আলোচনার পর ভোটাভুটি হলে দেখা যায়, সংস্কৃত ও হিন্দি সমসংখ্যক ভোট পেয়ে সবার শীর্ষে। ওই পরিস্থিতিতে জওহরলাল ডঃ সেনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সভাপতির কাস্টিং ভোট হিন্দির পক্ষে দেওয়া করান। যার ফলে, হিন্দি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়ে যায়। এ ধরনের অভিযোগ আমাদের অপরিচিত নয়। শ্রীগুহর কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, গণপরিষদে গৃহীত সংবিধানেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে, সংবিধান চালু হওয়ার পর পনেরো বৎসর পর্যন্ত ইংরেজি সরকারী ভাষা থাকবে; এরপর ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দি সরকারী ভাষা হবে।

চলাপতি রাওয়ের 'জওহরলাল নেহরু' সূত্রে জানা যায়, সংবিধানের বিধান মেনে সংবিধান চালু হওয়ার (জানুয়ারি, ১৯৫০) পাঁচ বৎসর পর বি. জি. খের-র এবং সংবিধানের অষ্টম তপসীল-এ উল্লেখ করা ভাষাগুলির মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে ভাষা কমিশন গঠিত হয়েছিল ('The Official Language Commission was appointed, under the provisions of the Constitution, five years after the commencement of the constitution with B.G. Kher...and members representing the languages specified in the Eighth Schedule')। অর্থাৎ, বি জি খের ভাষা কমিশনের সভাপতি বা প্রধান ছিলেন; এবং জওহরলালের তৎপরতায় ভাষা কমিশন গঠিত হয়নি।

ভাষা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব ছিল, সরকারী ভাষা বিবর্তন বাস্তবায়নের কর্মসূচী প্রস্তুত করা ('to affirm the constitutional settlement on official language and give it effect...')। ভোটাভুটির কোনও সুযোগ সেখানে ছিল না। আর, তা যদি থাকতও তাহলেও সভাপতির কাস্টিং ভোটের প্রয়োজন হোত না। কারণ, কমিশনে হিন্দিওয়ালা সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ('The members were largely committed to Hindi and the dissenting minutes were few.')। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাষা কমিশনের সুপারিশসমূহ সংবিধান মোতাবেক গঠিত পার্লামেন্টারি কমিটিতে বিবেচনার জন্য ('...which, under the constitution, was to consider the recommendations of the commission') পাঠানো হয়েছিল। পন্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ওই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

—বিমলেন্দু ঘোষ, পর্ণশ্রী-কলকাতা।

একি শুধুই অভিনয়!

এবার মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের পবিত্র ঈদ উৎসবে, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকলাপ দেখে, সাধারণ মানুষের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে, মমতা কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন? কারণ, বিভিন্ন মুসলমান এলাকায় দেখা গেলো মমতা দেবী মুসলমান মহিলাদের মতো নমাজ পড়ছেন। ঈদ উপলক্ষে সংবাদপত্রে মমতার যেসব ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য একটি হলো, কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি তাকে চাদর পরিয়ে দিচ্ছেন। আর একটি ছবিতে দেখা গেলো মমতা কলকাতার পার্ক সার্কাসে বসে আছেন ইফতার পার্টিতে। এইসব ছবি এবং সংবাদ ইসলাম ধর্মীয় মানুষকে যথেষ্ট আনন্দিত করেছে। কারণ এর ফলে তাঁর দল তৃণমূল-এ অনেকে সামিল হবেন। চারদিকের হিন্দু সমাজে ছড়িয়ে পড়বে ইসলাম ধর্মের মতাদর্শ। এ বিষয় নিয়ে জনৈক প্রবীণ রাজনীতিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন,—না এসব কিছু নয়। সিপিএমের সঙ্গে মুসলিম ভোট-ব্যাংক দখলের প্রতিযোগিতার থেকে মমতার

এইসব অভিনয়। এর ফলে মমতা যেমন কিছু বেশি মুসলিম ভোট পাবেন; তেমনি অনেক বেশি অমুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট হারাবেন। তবে যে যাই বলুক, নব্য যুগের হিন্দু সমাজের এই সব রাজনৈতিক ব্যভিচার দেখলে মনে হয়, হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করার জন্যই যেন এদের রাজনীতি করা।

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

মঙ্গল নিধি

গত ২৭ জুলাই সঙ্ঘের নবব্যারাকপুর নগরের বর্তমান ব্যবস্থা প্রমুখ ও সমাজ-সেবা ভারতীর প্রাক্তন প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষ সুনীল চক্রবর্তী তাঁর কনিষ্ঠপুত্র সৌমেনের বিবাহ উপলক্ষে বৌভাত অনুষ্ঠানে সকল নিমন্ত্রিত আত্মীয়-পরিজনের উপস্থিতিতে সমাজ সেবার কাজে ৫০০১ টাকা মঙ্গলনিধি তুলে দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহ ডঃ তিলকরঞ্জন বেরা ও প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল।

* * *

উত্তরদিনাজপুর জেলার করণদীঘি খণ্ডের আমোর গ্রাম নিবাসী সুবল দাস ও রাণী দাসের শুভ পরিণয় উপলক্ষে গত ২৪ আগস্ট সুবল দাসের পিতা রূপলাল দাস ও মাতা তালিবারিণ দাস সেবাকাজের জন্য উত্তরদিনাজপুর জেলা সেবা প্রমুখ অলীক কুণ্ডুর হাতে মঙ্গলনিধি তুলে দেন।

* * *

উত্তরদিনাজপুর জেলার কুশমুন্ডি খন্ডের বাঘরাই চন্ডী নিবাসী প্রলয় সরকার ও শেফালী সরকারের শুভবিবাহ উপলক্ষে গত ১৬ আগস্ট উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষের হাতে মঙ্গলনিধি তুলে দেন প্রলয় সরকারের বাবা-মা। বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর বিভাগ সেবা প্রমুখ অরবিন্দেন্দু বিকাশ পুততুন্ড (বাচ্চুদা)।

* * *

আয়লা অধ্যুষিত এলাকায় সঙ্ঘের সেবাকাজে প্রভাবিত হয়ে অচিন সরকার তাঁর পুত্রের (৫ বছর) জন্মদিন উপলক্ষে যোগেশগঞ্জ খণ্ড কার্যবাহ সন্তোষ মিস্ত্রির হাতে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া জেলা কার্যবাহ প্রবীর কুমার বিশ্বাসের পিতৃদেব মধুসূদন বিশ্বাসের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায় প্রবীরবাবুর মাতৃদেবী বিমলা বিশ্বাস শ্রাদ্ধ বাসরে ১০০১ টাকা সমাজের কাজের জন্য শ্রদ্ধানিধি হিসেবে তুলে দেন নদীয়া জেলা সঙ্ঘচালক ধীরেন দেবনাথের হাতে।

শোক সংবাদ

গত ২৪ আগস্ট নদীয়া জেলা কার্যবাহ এবং চাকদহের 'ঝাউচর' নিবাসী শ্রী প্রবীর বিশ্বাসের পিতৃদেব মধুসূদন বিশ্বাস স্বজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ২ কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

পরম্পরা

ষোড়শ মহাজনপদ ঃ অবন্তী

।। গোপাল চক্রবর্তী।।

অবন্তী ভারতবর্ষের প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ। 'অবন্তী' প্রাচীন ভারতের একটি পরাক্রান্ত জাতি এবং সেই জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল অবন্তী নামে খ্যাত ছিল। অবন্তী বলতে বর্তমান মালব, নিমার এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশকে বোঝাত। সম্ভবত বেত্রবতী নদী এই রাজ্যকে উত্তর এবং দক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত করেছিল। উত্তর অবন্তীর রাজধানী ছিল শিপ্রা তীরের উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণ অবন্তীর রাজধানী ছিল নর্মদা তীরের মাহিষ্মতী।

এই দুটি নগরই রাজগৃহ থেকে দক্ষিণে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথের উপর স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচীন সাহিত্যে কখনও কখনও উজ্জয়িনীকে অবন্তী এবং শিপ্রা নদীকে অবন্তী নদী বলা হয়েছে।

পুরাণ অনুসারে অবন্তী রাজ্যের প্রথম রাজবংশের নাম ছিল হৈহয়। অপর একটি পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে কার্তবীর্য-বংশীয় তালজঙঘ থেকে তালজঙঘ কুলের উদ্ভব এবং এর পঞ্চ শাখার নাম ভোজ, বীতিহোত্র, শার্যাত, অবন্তী এবং তুণ্ডিকেয়। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অবন্তী নামে জনৈক রাজা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন। পুরাণে রাজা অবন্তীকে যদুকুলের হৈহয় শাখার মাহিষ্মতী নগরাধিপতি কার্তবীর্যার্জুন বংশীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যে অবন্তী দক্ষিণাপথ নামে রাষ্ট্র এবং তার রাজধানী মাহিষ্মতীর নাম উল্লেখ লক্ষণীয়।

এই সকল কিংবদন্তী থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে প্রাচীন অবন্তী জাতির দেশ উজ্জয়িনী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং এক সময়ে দক্ষিণে নর্মদা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত অবন্তীগণের অধিকার প্রসারিত হয়েছিল। হয়তো এই সময়ে সুবিস্তৃত অবন্তী জনপদের উত্তরে উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণে মাহিষ্মতীকে কেন্দ্র করে দুটি পৃথক রাজত্ব গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ লেখকেরা দক্ষিণ অবন্তীকে অবন্তী দক্ষিণাপথ বলেছেন এবং অনেক সময় একে অশ্মক দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে অশ্মকাবন্তী শব্দ ব্যবহার করেছেন। অশ্মকরাজ্যের রাজধানী ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামাবাদ জেলার অন্তর্গত বোধন। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল 'পৌদন্য'। অবন্তী দক্ষিণাপথ রাজ্য নর্মদার দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মূল অবন্তী রাজ্য অর্থাৎ উজ্জয়িনী অঞ্চলকে বর্তমানে পশ্চিম মালব বলা হয়। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ উজ্জয়িনী এবং মালব দেশকে আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছেন। অতএব মনে করা যেতে পারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ওই জনপদটির মালব নাম প্রচলিত হয়নি। মালব গুজরাটের মহানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বাণভট্ট তাঁর কথাকাব্য কাদম্বরীতে উজ্জয়িনীকে অবন্তী জনপদের এবং বিদিশা

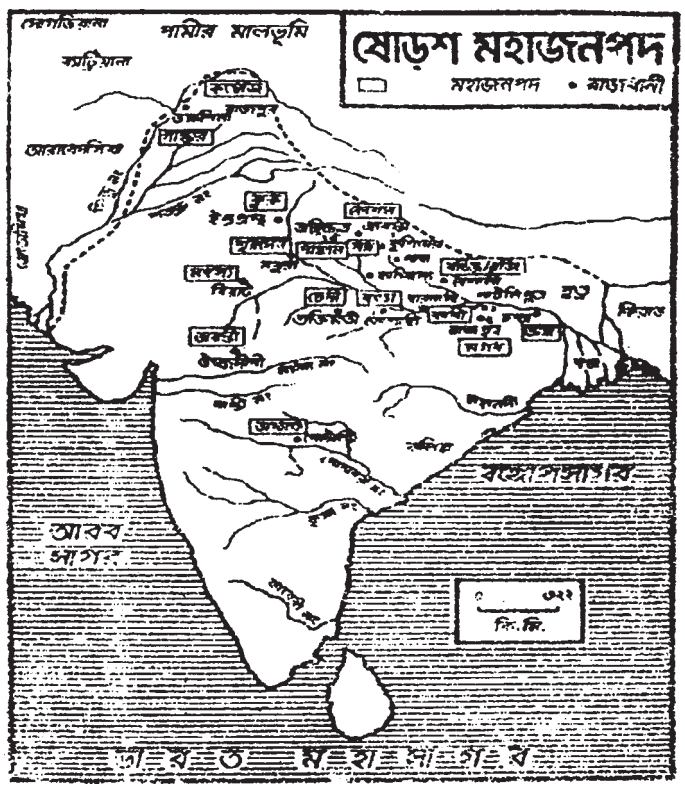

নগরী অর্থাৎ বর্তমান ভিলসার নিকটবর্তী বেসনগরকে মালব দেশের প্রধান নগর বলেছেন। এই প্রাচীন ধারা অবলম্বন করে মধ্যযুগেও অনেকে পূর্ব ও পশ্চিম মালবকে যথাক্রমে মালব ও অবন্তী নামে উল্লেখ করেছেন। উজ্জয়িনী অঞ্চল বোঝাতে মালব নামের ব্যবহার সম্ভবত খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই সময় গুজরাটের অন্তর্গত মালব দেশ থেকে এসে পরমারগণ পশ্চিম মালবে বসবাস শুরু করেন।

ভারতের ঐতিহ্যে অবন্তী বা মালব অর্থাৎ পশ্চিম মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরী সুপ্রসিদ্ধ। খৃঃপূঃ ষষ্ঠ শতকে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কালে অবন্তীর বিখ্যাত রাজা ছিলেন প্রদ্যোৎ। তিনি চাণ্ড প্রদ্যোৎ মহাসেন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। কোশল এবং মগধের সঙ্গেও তার সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধির আরেক কারণ এর সুবিখ্যাত মহাকাল মন্দির। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে এই মহাকাল মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই উজ্জয়িনী কিংবদন্তীর সুবিখ্যাত শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। এই বিক্রমাদিত্যকে খৃঃপূঃ ৫৮ অব্দ থেকে গণিত বিক্রমসংবতের স্রষ্টা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কীর্তিকাহিনীই জনশ্রুতির 'বিক্রমাদিত্য' কল্পনার মূল ভিত্তি বলে মনে হয়। সম্ভবত বৈদেশিক শকরাজগণ ভারতবর্ষে যে সংবতের ব্যবহার শুরু করেছিলেন খৃস্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীতে এর সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের নাম সংযুক্ত হয়েছিল। খৃঃপূঃ চতুর্থ শতকের শেষের দিকে অবন্তী রাজ্য মগধের অধীনে চলে গেলেও পরবর্তীকালে গুপ্তপূর্ব যুগের শকেরা অবন্তী পুনরুদ্ধার করে। বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের বিতাড়িত করে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

মুম্বইয়ের সিদ্ধি দাতা সিদ্ধি বিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটের দিকে চোখ বুলিয়েই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ১৭ বছরের পূরবী রাও। এ বছর প্রায় ৮৩ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন মুম্বইয়ের এই কৃতী ছাত্রীটি। কিন্তু এই সাফল্যের সিকিভাগ কৃতিত্বও নিজের কাঁধে চাপাতে নারাজ পূরবী। কারণ তার দাবী "শ্রীসিদ্ধি বিনায়কের আশীর্বাদ ছাড়া পরীক্ষার এই ফল কিছুতেই সম্ভব হোত না।" পূরবীর এই দাবীকে বিজ্ঞানীমহল কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দিলেও, পূরবীর মতো লক্ষাধিক ভক্তের মনের মণিকোঠায় বছরের পর বছর একই ভাবে পূজিত হচ্ছেন শ্রীশ্রীসিদ্ধি বিনায়ক।

তবে শুধু মুম্বইতেই নয়, সিদ্ধি বিনায়কের মহিমা মহারাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোটা বিশ্বের দরবারে। বিশ্ববাসীর চোখে তিনি শুধু শ্রী সিদ্ধি বিনায়কই নন, ভগবান গণেশ বা সিদ্ধি দাতা গণেশ হিসাবেও পূজিত হন। সরকারি তথ্যানুযায়ী, "সিদ্ধি বিনায়কের মন্দিরটি প্রথম উৎসর্গ করা হয় ১৮০১ সালের ১৯ নভেম্বর। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। উচ্চতায় প্রায় আড়াই ফুট এবং ২ ফুট চওড়ার এই মূর্তিটি নির্মাণ হয় কালো পাথর দিয়ে। প্রথমাবস্থায়, সিদ্ধি বিনায়কের মন্দিরটি গড়ে ওঠে একটা ছোট কাঠামোর মধ্যে। পরবর্তীকালে, সেখানে নির্মাণ করা হয় একখানি বৃহৎ ও বিশাল একশিলা স্তম্ভের কাঠামো। মূর্তিটির পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে এবং হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি মেনেই প্রতিষ্ঠা করা হয় এই স্তম্ভটি। ১৯৯৪ সালের ১৩ জুন মন্দিরটির মুখ্য উৎসর্গের দিন হিসেবে পালিত হয়। ওইদিন কলস প্রতিষ্ঠা ও কুম্ভাভিষেক স্বহস্তে সুসম্পন্ন করেন শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য ভারতীতীর্থ মহাস্বামী।"

১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে মন্দির পরিচালনার স্বার্থে শ্রী সিদ্ধি বিনায়ক গণপতি মন্দির (প্রভাদেবী) ট্রাস্ট গঠন করেন সরকার। মন্দিরের নিত্যদিনের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নির্মাণ করেন ৯ জন সদস্যের একটা কমিটি। শুধু মন্দিরের কাজকর্ম চালানোই নয়, ট্রাস্টের দৌলতে গড়ে উঠেছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। বৃত্তির সুযোগ দেওয়া হয় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের। সিদ্ধি দাতাকে নিয়ে ভক্তদের এই উন্মাদনা শুধু মুম্বাইতেই নয়, ছড়িয়ে পড়েছে মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত জেলাগুলিতেও। হিন্দু শাস্ত্রমতে কোনও নতুন কাজে হাত দেওয়ার আগে সিদ্ধি দাতা গণেশের আরাধনা করা আবশ্যিক। কারণ কার্যক্ষেত্রে সমস্ত বাধাবিঘ্নের অবসান ঘটান সিদ্ধি দাতা। তাই গণেশকে 'বিঘ্নহর্তা' বলেও আখ্যা দেওয়া হয়।' দু'দশক ধরে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধি বিনায়কের মন্দিরটিতে পরিবর্তনের বহু ছোঁয়া লাগলেও, বদলের ছায়া পড়েনি সিদ্ধি দাতার মূর্তিটিতে। মন্দিরের এক কর্মচারী এই প্রসঙ্গে বলেন, "সিদ্ধি দাতার মূর্তিটি শুধু জাগ্রতই নয় অভিনব ও ব্যতিক্রমীও বটে। মূর্তিটিতে যে শুঁড়টা আছে সেটা মুখের বাঁ দিকে নয়, ডান দিকে অবস্থিত। যেহেতু মূর্তিটির চারটে হাত আছে তাই এটাকে চতুর্ভুজ বলেও অভিহিত করা হয়। সিদ্ধি বিনায়কের উচ্চ ডানহস্তে আছে পদ্মফুল, ছোট কুড়ুল আছে উচ্চ বাম হস্তে, নিম্ন ডান হস্তে পবিত্র জপমালা ও নিম্ন বাম হস্তে আছে পাত্রে ভরা সুস্বাদু মিষ্টি বা লাড্ডু। সিদ্ধি বিনায়কের পার্শ্বদেশে অবস্থিত আছে রিদ্ধি ও সিদ্ধি নামক দুজন দেবতার মূর্তি। এরা পবিত্রতা, পরিপূর্ণতা ও ধনসমৃদ্ধির প্রতীক। মূর্তিটির কপালে একটা চোখও লক্ষ্য করা যায়, যা মহাদেবের তৃতীয় নয়ন বলে প্রচলিত।"

ভগবান সিদ্ধি বিনায়ক

যদিও প্রতিনিয়ত লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম ঘটে মন্দির প্রাঙ্গণে, কিন্তু প্রতি মঙ্গলবার এক নতুন উৎসবের সাজে সজ্জিত হয় সিদ্ধি বিনায়কের মন্দির। সোমবার রাত থেকেই ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় যায় উৎসবের রেশ। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন সিদ্ধি দাতা দর্শনে। মন্দিরের বাইরে হয় লম্বা লাইন। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি বাদ যান না কেউই। সোমবার সারারাত ধরে, এমনকী মঙ্গলবার সকালের প্রতীক্ষা করতে থাকেন অজস্র ভক্তবৃন্দ।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে বসে যায় মেলার হাট। সারি দিয়ে বিক্রি হয় ধূপ, ফুল, নারকেল, চাদর ও ভগবান গণেশের ছবি। স্থানীয় দোকানদার লক্ষণ সিন্ডের কথায়, 'অন্যদিনের তুলনায় মঙ্গলবার লাভ হয় বেশি। কোনও কোনও বার প্রায় ২৫ হাজার টাকার বিক্রিও হয়ে যায়।" এছাড়া মেলায় বিক্রি করা হয় গণেশের বিভিন্ন ভজন ও ভক্তিমূলক গানের ক্যাসেট। মন্দিরের ভিতর যে পবিত্র স্থানটিতে আরতি করা হয় সেটাই গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহ ১৩ ফুট উচ্চতার তিনটি প্রবেশদ্বার আছে। প্রবেশদ্বারগুলি নির্মাণ করা হয়েছে ছিদ্রাবলী কাঠের দ্বারা। প্রবেশদ্বারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করছে আস্থা গণপতি, আস্থা লক্ষ্মী ও দশ অবতারের বিভিন্ন কীর্তিকে। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে অবস্থিত গোল গম্বুজাকারটি অলংকৃত করা আছে সোনার পাত দিয়ে। সোনার পাতের এই কারুকার্য সিদ্ধি বিনায়কের মূর্তির শোভা যেন আরও বাড়িয়ে দেয়।

মঙ্গলবার সারাদিন ধরে মন্দির প্রাঙ্গণে চলে পঞ্চামৃত পুজা, শ্রী সত্যনারায়ণ পূজা ও লঘুরুদ্র পূজা সহ বিভিন্ন পূজা। দর্শনার্থীদের থেকে সামান্য প্রণামী নিয়ে বিতরণ করা হয় প্রসাদ। সারাদিন রাত ধরে বাজতে থাকে মন্দিরের ঘণ্টা।

রেস্টোরেশন শিল্পে দক্ষ শিল্পী উদ্ধৃতি

মিতা রায়

যে কোনও রঙ চটা, নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিস— তা সে যতই মূল্যবান হোক, আমরা সরিয়ে রেখে দিই। প্রয়োজনে ফেলে দিতেও দ্বিধা করি না। কিন্তু কখনও ভেবে দেখি না যে সেইসব সরিয়ে রাখা অমূল্য শিল্পকে নতুন করে রূপ দেওয়া যায়। সে কাজও শিল্পীর কাজ এবং এই কাজের ইংরেজি নামকরণ 'রেস্টোরেশন' (Restoration)। রেস্টোরেশন কাজে এমনই এক দক্ষ শিল্পীর কথাই জানাব এই প্রতিবেদনে। কেমন করে এই পথে আসা যায়, কাজের ক্ষেত্র কি ধরনের এবং এর পদ্ধতিই বা কি— নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রেস্টোরার উদ্ধৃতি দাস। বয়সে সদ্য যুবতী উদ্ধৃতি। ছোট থেকে আঁকতে ভালবাসত। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হয় শিল্পকলা নিয়ে পড়াশোনা করতে। একে একে সাফল্যের সঙ্গে বি. ভি. এ (Bachelor of Visual Art), এম. ভি. এ (Master Degree of Visual Art) ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। কিন্তু চিরাচরিত ফাইন আর্টে না গিয়ে রেস্টোরেশন-এ আগ্রহ এল কীভাবে, জানালেন শিল্পী ঃ রবীন্দ্রভারতীতে পড়াশোনা করার সময়ে ওখানে মিউজিয়ামে যেতাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সব জিনিসপত্র, আঁকা ছবি, ছেঁড়াফাটা চিঠিপত্র, অন্যান্য শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখতে খুব ভাল লাগত। কিছু কিছু ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলো ঠিক করা হোত। সেগুলো দেখতে থাকতাম। ওখানকার পরিবেশটা খুব ভাল লাগত। নানা ধরনের কাজের মধ্যে ২০০৪-এ 'ডিজাইন অব্ বেঙ্গল টাইপিং'-এর ওপর ন্যাশানাল স্কলারশিপ পাই। যাই হোক, জৌলুসহীন শিল্পকর্মকে পুনরুদ্ধার করার নেশায় আমি ডুবে গেলাম।

উদ্ধৃতি দাস

এরপর ন্যাশানাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি ফর্ কনজারভেশন অব্ কালচারাল প্রপারটিতে পড়তে যান লক্ষ্ণৌতে। দশদিনের কোর্স ছিল পেপার পেন্টিং-এর ওপর। ওখানকার ওয়ার্কশপ-এ যোগদান করেন। সংস্থার ডিরেক্টর জি. ও. পি. আগরওয়াল তাঁকে কলকাতার ক্যালকাটা ক্লাবে চারমাসের একটা প্রজেক্টে পাঠান। কোর্সটা ছিল অয়েল পেন্টিং-এর ওপর। সেই প্রজেক্টে উদ্ধৃতি কাজ করেন এবং সুখ্যাতি অর্জন করেন। এরপর 'ইনটাক' রবীন্দ্রসদন-এর কাছে একটা সেন্টার খোলে এই ধরনের হেরিটেজ-কাজের। তাঁর কথায়— 'ক্যালকাটা ক্লাবে প্রজেক্ট শেষ করে ইনটাক-এর সেন্টারে রেস্টোরার হিসেবে কাজে যোগদান করি। ইনটাক কথাটির পুরো নাম হলো—ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রাস্ট ফর্ আর্ট এণ্ড কালচারাল হেরিটেজ (চত্বরট্রেন্ড্র)। ওখানে ২০০৫-'০৮ পর্যন্ত কাজ করেছিলাম। বর্তমানে আমি চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে কাজ করছি।'

সাধারণ শিল্পকলা নিয়ে অর্থাৎ নতুন নতুন সৃষ্টির কাজে না গিয়ে এ ধরনের কাজে আগ্রহী হলেন কেন? প্রশ্নের উত্তরে সাবলীল জবাব— দেখুন সব শিল্পীই নতুন কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ভারতের যে ঐতিহ্যপূর্ণ ছবি, ভাস্কর্য, সেগুলো তো এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজ যা নতুন, একদিন সেগুলোও জরাজীর্ণ হয়ে যাবে। সেগুলোকেও তো বাঁচিয়ে রাখা দরকার। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হেরিটেজগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন, না হলে তারা ইতিহাস বলে কিছু জানবে না। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আমি রেস্টোরেশন-এর কাজে এসেছি। প্রথমে ছিল নেশা, এখন পেশা করে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি।

রেস্টোরেশন করার কাজ কিভাবে করা যায়, সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষ জানে না। এরও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এ ব্যাপারে শিল্পী জানালেন— না, শিল্পী হলেই কিন্তু রেস্টোরেশন করতে পারবেন, তা নয়। এর জন্য কিছু প্রশিক্ষণ অবশ্যই দরকার। প্রথমত, যে কাজ করা হবে, তা রিভার্সেবল মেটিরিয়াল দিয়ে করা দরকার। পারমানেন্ট কোনও কিছু ব্যবহার করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, রি-টাচিং এমনভাবে করতে হবে যেন শুধুমাত্র ড্যামেজ জায়গাতেই করা যায়। তৃতীয়ত, রেস্টোরেটরকে অবশ্যই কেমিস্ট্রি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। কেননা, পুরো কাজটাই কেমিক্যাল নির্ভর। খুব সযত্নে লালিত করতে হবে যেন আসল ছবি বা কাজ বদলে না যায়। অনেকেই সঠিক পদ্ধতি জানেন না বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজটা নষ্ট হয়ে যায়। রেস্টোরেশন-এর কাজ অয়েল পেন্টিং, পেপার পেন্টিং, টেক্সটাইল পেন্টিং-এর ওপর হয়।

তিনটি স্তরেই দক্ষতার সঙ্গে রেস্টোরেশন-এর কাজ করে তিনি আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক নামী শিল্পী, বিগত দিনের এবং বর্তমান সময়ের শিল্পীদের কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, হেমেন মজুমদার, জে পি গাঙ্গুলি, অতুল বসু, অসিত হালদার প্রমুখ শিল্পীর কাজ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এদিকে বিকাশ ভট্টাচার্য, পরিতোষ সেন, সুব্রত গাঙ্গুলির কাজও করেছেন। এছাড়া, জরাজীর্ণ চিঠিপত্র, ভাস্কর্য, এমনকি কালীঘাটের পট নিয়েও কাজ করেছেন। আজকে শুধু নিজের কাজে নয়, বাংলার বাইরে থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছেন রেস্টোরেশন-এর কাজে। সম্প্রতি রাজস্থানের রাজপরিবার থেকে আসা আমন্ত্রণে জে পি গাঙ্গুলির চারটে অয়েল পেন্টিং রেস্টোর করেছেন।

এখন এই নিয়ে মগ্ন উদ্ধৃতি। শিল্প জগতের এদিকটাকে আরো প্রসারিত ও প্রচার করবার জন্য নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে চায় নবীন শিল্পী। ইতিমধ্যে ২০০৯-এর মার্চ মাসে চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে ৩০টা রেস্টোর ছবির প্রদর্শনী হয়। ছবির সময়কাল ছিল ১৮৫০-১৯৫০। এখন বিদেশে গিয়ে আরও উন্নততর প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক। তিনি জানালেন ঃ আমি চাই ভবিষ্যতে রেস্টোরেশন-এর কাজের সেন্টার খোলার। সেই কারণে প্রশিক্ষণ যাতে আধুনিক হয়, সে বিষয়ে বিদেশে গিয়ে পড়ে আসতে চাই। ওখানকার প্রগতিশীল ল্যাবরেটরি দেখে আসতে চাই। নিজের দেশে এই শিল্পকে আরও ভালভাবে জানাতে ও ভালো কাজ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার কাছে এ কাজ নেশা-পেশা শুধু নয়, প্যাশন। আজ এই কাজে আসার পেছনে আছে পি সি কেজরিওয়ালের অনুপ্রেরণা।

অঙ্গনা

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ১০

মজদুর সঙেঘর বিক্ষোভ

গত ৩০ আগস্ট কলকাতা জেলা বি এম এস ও গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ন্যাশানাল কনফেডারেশন-এর সহযোগিতায় মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মোট পাঁচ দফা দাবীর সমর্থনে সারাদিনব্যাপী কলকাতা জিপিও-র মূল প্রবেশদ্বারে এক বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। উক্ত বিক্ষোভ আন্দোলনে বক্তব্য রাখেন বি এম এস-এর জেলা সম্পাদক রাজারাম প্রসাদ ও প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক দিলীপ পাল এবং জি ই এন সি-র সম্পাদক শক্তি কুমার পাঠক। সভার শেষে ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে একটি ডেপুটেশন দেন।

জুট মজদুর সঙেঘর অধিবেশন

বি এম এস অনুমোদিত 'ভারতীয় জুট মজদুর সঙেঘর' দু'দিন ব্যাপী ১৯ তম ত্রিবার্ষিক অধিবেশন গত ২৮ ও ২৯ আগস্ট ভদ্রেশ্বরের 'নেতাজী টাউন হল'-এ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দু'শো প্রতিনিধি ওই সম্মেলনে যোগ দেন। অধিবেশনে বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য 'বেতন নির্ধারণ বোর্ড'-আইন তৈরির দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সেবা ভারতীর রাখীবন্ধন

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও সেবা-ভারতীর প্রচেষ্টায় দুর্গাপুর মহকুমার ফরিদপুর খণ্ডের বিভিন্ন গ্রামে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। সেবা ভারতীর বিভিন্ন প্রকল্পের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ জনের সঙ্গে রাখীর মাধ্যমে সম্পর্কে করা হয়। মাতৃসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয় গত ২৯ আগস্ট ইচ্ছাপুর পঞ্চায়েত ভবনে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি চ্যাটার্জী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর শিশুমন্দিরের প্রধানাচার্যা সুরভি চৌধুরী ও আসানসোল সংস্কার ভারতী'র মনীষা বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষিকা সলমা বক্সী।

পাণ্ডুয়ায় রাখী উৎসব

মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনীর পরিচালনায় হুগলি জেলায় পাণ্ডুয়া প্রখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে যেমন— থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, পাণ্ডুয়া স্টেশন এলাকায় ৫০০ জনের হাতে রাখী বাঁধা হয়। এছাড়া একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মায়েদের হাতে রাখী বাঁধা হয়। সেই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রান্তীয় মাতৃশক্তি সহ-সংযোজিকা সুভদ্রা শর্মা। সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তমানন্দ গিরি মহারাজ।

গত ৩,৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য বিজেপি আয়োজিত 'প্রবেশ প্রশিক্ষণ বর্গ'-এ ভাষণরত বিনয় সহস্রবুদ্ধে। মঞ্চাসীন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্র-যুব সম্মেলন

গত ২৯ আগস্ট বাঁকুড়ার মাচানতলায় 'পৌরসভা সভাগৃহে' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর বাঁকুড়া নগরের রাখীবন্ধন উপলক্ষে আয়োজিত হয় এক ছাত্র-যুব সম্মেলন। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ গৌতমবুদ্ধ সুরাল। শহরের বিভিন্ন কলেজের প্রায় ১৭৫ জন ছাত্র এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। রাখীবন্ধন ও রাষ্ট্রবন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নরেশ ভবনে রাখীবন্ধন

ভারতীয় মজদুর সঙেঘর প্রাদেশিক কার্যালয় নরেশ ভবনে গত ২৪ আগস্ট রাখীবন্ধনীর দিন মজদুর সঙেঘর পতাকার সামনে কার্যকর্তাগণ সমবেত হয়ে 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠান পালন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রাদেশিক সভাপতি অরুণ মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ পাল ও জি ই এন সি-র প্রদেশ সম্পাদক শক্তি পাঠক প্রমুখ।

বলরাম জয়ন্তী পালন

প্রতি বছরের মতো এবছরও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বহুস্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের জন্মজয়ন্তী পালন করলো ভারতীয় কিষাণ সঙেঘর পশ্চিমবঙ্গ শাখা। বহু স্থানেই এই উপলক্ষে আয়োজিত হয় ক্যুইজ, অঙ্কন এবং অধিক পরিমাণে দুধ দেয় এমন দেশী গোরুর প্রদর্শনী। কোচবিহার জেলার নাসরুর হাট, মাথাভাঙার কুর্শামারি, জলপাইগুড়ি জেলার ডাঙ্গাপাড়া, নকশালবাড়ির হাতিঘিসা, উত্তরদিনাজপুরের মহেশপুর, নন্দন গ্রাম ইত্যাদি স্থানে ঢাক, ঢোল ও কীর্তনের মাধ্যমে বলরাম জয়ন্তী পালন করা হয়। দক্ষিণদিনাজপুর জেলায় সুতোইল বাংলাপাড়ায় বলরামদেবের পুজো অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন অজিত বারিক ও সঙেঘর জেলা সম্পাদক অধীর দাস। এই অনুষ্ঠানে ২৫০ জন মহিলা সহ ৭০০ জন পেশায় কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

হনুমৎ শক্তি জাগরণ

গত ১৬ আগস্ট হুগলি জেলার ব্যান্ডেলে রাম-জানকী মন্দির লোকোপাড়ায় হনুমৎশক্তি জাগরণ উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন তিতিক্ষানন্দ মহারাজ ও উত্তমানন্দ গিরি মহারাজ। বারোটি প্রখণ্ড থেকে প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য, উমেশ গিরি প্রমুখ। গত ২২ আগস্ট হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রখণ্ড যেমন রিষড়া, মগরা, ত্রিবেণী, খন্যান, বৈঁচি, বলাগড়, পাণ্ডুয়া ও চুঁচুড়ায় হনুমৎশক্তি জাগরণ অনুষ্ঠান হয়।

সংস্কৃত মহোৎসব

সুরভারতী সংস্কৃত ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ২৪ আগস্ট থেকে ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭দিন সংস্কৃত মহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন স্থানে। স্থানগুলি হলো—উত্তর কলকাতায় স্বামীজীর জন্মভিটে, রামমন্দির স্কুল, ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ি, ডানলপে মহামিলন মঠ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (কলকাতা), কুঠিয়া বাবা আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগণা) ও শঙ্কর মঠ (হাওড়া)। স্বামীজীর জন্মভিটের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দের বাড়ির সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ, শ্যামল সেন প্রমুখ।

শঙ্খনাদের মহিলা সম্মেলন

সমাজে সমরসতা নির্মাণের উদ্দেশ্যে কর্মরত শঙ্খনাদ সমরসতা মিশন'-এর উদ্যোগে প্রথম মহিলা কার্যকর্তা সম্মেলন গত ১৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরির হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ষাটজন কর্মকর্ত্রী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী কুসুম মুন্দ্রা এবং সীমা রস্তোগী। সম্মেলনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল— সবদ-কীর্তন এবং তিরিশ জন শিখ ভগিনী ও বন্ধুর যোগদান। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান কুসুম লুণ্ডিয়া।

স্মরণসভা

গত ২৬ আগস্ট সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি সঙঘ কার্যালয়ে বংশীলাল সোনীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। নগরের পুরোনো ও অনেক নতুন স্বয়ংসেবক শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে নগরের প্রমুখ কার্যকর্তা চন্দন রায় বংশীদার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

সমাবেশ সমাচার

ইতিহাস চর্চা

গত ৩০ আগস্ট মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমন্ত্রণে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট. প্রাপ্ত অধ্যাপক প্রণব রায় তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত দুটি বিষয়ের ওপর ভাষণ দেন। প্রথম ভাষণটি ছিল 'সোস্যাল ব্যাক্গ্রাউণ্ড অফ টেম্পল বিলডার্স অ্যাণ্ড ফাউণ্ডার্স— ইন সাউথ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড সোস্যাল মবিলিটি' এবং দ্বিতীয় ভাষণটি ছিল 'সিল্ক অ্যাণ্ড ইণ্ডিগো ইণ্ডাস্ট্রিজ্ ইন সাউথ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন দ্যা কলোনিয়ান পিরিয়ড্'। ইতিহাস বিভাগে আঞ্চলিক ইতিহাস পাঠরত এম. এ. ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই 'এক্স্টেনশন লেকচারে'র ব্যবস্থা করা হয়।

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৌড় প্রতিযোগিতা

গত ১ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর উত্তর দিনাজপুর জেলার মহারাজা খণ্ডের স্বয়ংসেবকদের পরিচালনায় 'ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৌড় প্রতিযোগিতা' আয়োজিত হয়। বিন্দোল থেকে মোহিনীগঞ্জ পর্যন্ত মোট ৫ কিলোমিটার এই প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীর হাতে ভারতমাতার বাঁধানো ছবি পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়।

রাজ্য জুড়ে কবিপ্রণামের অনুষ্ঠান

সিউড়ি

সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখার উদ্যোগে উদযাপিত হলো—'সার্ধ শতবর্ষে কবিপ্রণাম'। গত ২২ আগস্ট সন্ধ্যায় সিউড়ি

সিউড়িতে সুপ্রিয় ঠাকুর

রবীন্দ্রসদন মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথের প্রপৌত্র অধ্যক্ষ সুপ্রিয় ঠাকুর। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অমিতাভ চৌধুরী। সংস্থার পূর্বাঞ্চল সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য, সভানেত্রী লোকসভ্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী, প্রাদেশিক সহ-সভাপতি সোমেশ্বর বড়াল। অনুষ্ঠানে দুই বিশিষ্ট অতিথি রবীন্দ্রনাথের প্রপৌত্র সুপ্রিয় ঠাকুর ও অমিতাভ চৌধুরীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

কবিপ্রণাম উৎসবের উদ্বোধক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, দেশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবর্ষে নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। তবে সংস্কার ভারতীর কবিপ্রণাম উৎসব-এর ভাবনা অবশ্য স্বতন্ত্র যা প্রশংসার দাবী রাখে।

অনুষ্ঠানে বীরভূম জেলাব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'বহু কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' পরিবেশন করেন সংস্থার ৫০ জন শিল্পী। পরিচালনায় প্রবীর দাস।

গীতাঞ্জলির শতবর্ষে সংস্কার ভারতীর বিশেষ নিবেদন— 'নব নব রূপে এসো প্রাণে'। এই অনুষ্ঠানে গীতাঞ্জলির গান, কবিতা ও প্রেক্ষাপট অবলম্বনে নৃত্যগীতি আলেখ্যর সফল উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। নিত্য পরিচালনায় মৌমিতা বিষ্ণু, শিপ্রা মুখার্জি। সিউড়ি শাখার সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রবীন্দ্রনাথের কথা, কবিতায় অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন তিলক সেনগুপ্ত।

সোনারপুর

মঞ্চের একধারে জুঁইফুলের মালায় সুসজ্জিত নটরাজ ও রবিঠাকুরের ছবি, সামনে যত্নে নক্সা করা কলসে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, পাশে প্রদীপ জ্বলছে। মঞ্চের পিছনে জ্বল জ্বল করছে রবীন্দ্রনাথের মুখচ্ছবি। পাশে লেখা 'আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে/তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।' এমনি এক পরিবেশে সংস্কার ভারতী সোনারপুর শাখা গত ২২ আগস্ট রাজপুর উৎপল দত্ত মঞ্চে আয়োজন করেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধ জন্মশত বর্ষে 'কবিপ্রণাম' অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কার্যকরী উপদেষ্টা পূর্ণচন্দ্র পুইতুন্ডি। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে

সোনারপুরে কবিপ্রণাম

সম্মান স্মারক প্রদান করে 'গুণীজন সম্বর্ধনা' জানানো হয়।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রেম নিয়ে সঙ্গীতালেখ্য 'আকাশ জুড়ে শুনিনু' অনুষ্ঠানটির নিবেদন ছিল অপূর্ব। সঙ্গীত পরিচালনা করেন চৈতালী মন্ডল, ভাষ্যপাঠে রাজীব চট্টোপাধ্যায় ও অন্তিমা মান্না(সাহু) ও আবহে ছিলেন পার্থসারথি চৌধুরী।

সংস্কার ভারতীর নাট্যকর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে দু-দিনের এক নাট্য কর্মশালার আয়োজন করেছিল সংস্কার ভারতী। বিষয় ছিল অভিনয়। বর্ধমান, দুর্গাপুর, বারুইপুর, কালিকাপুর, বজবজ এবং কলকাতা ও ২৪-পরগণার মোট ২০ জন নাট্যশিল্পী এই কর্মশালায় অংশ নেয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামল ঘোষ। প্রশিক্ষকরূপে ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট অভিনেতা-নির্দেশক অশোক মুখোপাধ্যায়। তিনি একদিকে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক— চারপ্রকার অভিনয়ের কথা বলেছেন এবং সেইসঙ্গে সেই লালফাঙ, স্তানিস্লাভ্সিক ও ব্রেখটের অভিনয় রীতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। সেইসঙ্গে প্রত্যেককে অভিনয় করিয়ে শরীর, কণ্ঠস্বর, মন ও স্পেস কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও দেখিয়েছেন। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণ-কারীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই কর্মশালা সঞ্চালনা করেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় নাট্যপ্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য।

২৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণের বিরুদ্ধে কলেজ স্ট্রীটে বিদ্যার্থী পরিষদের পথ অবরোধ।

রঙ্গম

রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম পূজা' কবিতাটি কাব্যনাট্য রূপে পরিবেশনে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার ছাপ রাখেন রাজীব, অন্তিমা ও অগ্নিভ মুখোপাধ্যায়। একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন শ্রী দেবাশীষ সেনগুপ্ত। শিশু শিল্পী শুভদীপ ও দীপাঞ্জন নাথের আবৃত্তি, বর্ষাকে আহ্বান জানিয়ে চারটি বর্ষার গান নিয়ে নীলাক্ষি দাসের পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠান 'ওই আসে অতি ভৈরব হরষে', সেই সঙ্গে রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি সহ ভাষ্যপাঠ অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

পাঠচক্রের রবীন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় বেহালা গার্লস হাইস্কুলে বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের ৪৩ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে অধ্যাপক উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুভাষ সাহা। পাঠচক্রের স্থায়ী সম্পাদক অলোক বরণ চট্টোপাধ্যায় তার ছোট্ট বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাঠচক্রের ৪৩ বৎসরের বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের উল্লেখ করেন। এছাড়া নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও গীতি আলেখ্য ছিল সকলের কাছে আকর্ষণীয়। শতাধিক শ্রোতা এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে সানন্দে উপভোগ করেন।

নটরাজ বন্দনা দিবস

ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে সংস্কার ভারতীর উত্তরপাড়া শাখা ২৫ জুলাই পালন করলো 'নটরাজ বন্দনা দিবস' হিসাবে। কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় অনুষ্ঠানের সূচনা— শাখা সম্পাদিকা শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ভাবসঙ্গীত-"সাধয়তি সংস্কার ভারতীর" মধ্যে দিয়ে। এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত।" একক সঙ্গীতে ছিলেন চিত্রা মুখার্জি, রীতা দাস, সুবীর মল্লিক ও প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী অচিন চক্রবর্তী।

"রূপকক্ষে"র প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় গুরুর মহিমা আধারিত শ্রুতি নাটক "উত্তরণ"। অংশগ্রহণে প্রীতি চট্টোপাধ্যায় ও সরোদ মান্না প্রমুখ।

"নটরাজ বন্দনা" উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শাখা সভাপতি অধ্যাপক বিজয় চক্রবর্তী। উৎসব পরিচালনায় ছিলেন সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত বিকাশ পরিষদের আয়োজনে 'পুকার ২০১০'

গত ২৮ আগস্ট কলকাতার সল্টলেকে রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনে আয়োজিত হলো মনোরম সঙ্গীত প্রতিযোগিতা পুকার-২০১০। আয়োজক ভারত বিকাশ পরিষদের লবণহ্রদ শাখা। প্রসঙ্গত, ১৯৬৩ সালে জাতীয় সংহতির স্বার্থে অরাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে এই সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন

ভূমি-রাজস্ব সচিব দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠের প্রেসিডেন্ট নিত্যমুক্তানন্দ মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারত বিকাশ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পি ডি ভূত, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পি আর মুন্দ্রা, লবণহ্রদ শাখার সভাপতি তথা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি হরিশ চোপড়া প্রমুখ। দু'টি পর্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য ও এম বি কর। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায় ছিল দেশ ও সমাজের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত ও দ্বিতীয় পর্যায়ে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানটি তিনটি শব্দমালায় গাঁথা ছিল। তিনটি শব্দ যথাক্রমে— ডিউটি (কর্তব্য), অনার (সম্মান) ও কান্ট্রি (দেশ)। যার অর্থ প্রথমেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক নৃপেন আচার্য— 'প্রোটেক্ট অ্যান্ড সিকিওর আওয়ার অনার ইন দিস কান্ট্রি। দিস ইজ আওয়ার ডিউটি'। মঞ্চাসীন ভারত বিকাশ পরিষদের কার্যকর্তাদের স্মৃতিচারণায় বারবার উঠে এসেছে লালা হংসরাজ ও ডাঃ সুরজ প্রকাশ আগরওয়ালের নাম, যাঁরা স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে চীনের ভারত আক্রমণের (১৯৬২) পরিপ্রেক্ষিতে নতুন স্বাধীনতার খোঁজ করেছিলেন। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে রচিত হয়েছিল অনেক গান। আর পুকার ২০১০-এর সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছ'টি স্কুলের প্রতিযোগিতার মাপকাঠিই ছিল ওই সমস্ত গান। 'চেতনা কি সুর' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা ছিল সেইসব গানগুলি। তার মধ্যে থেকে 'ক্রান্তি কি মশাল সে', 'তুম সময় কে লিয়ে', 'সংগ্রাম জিন্দেগী হ্যায়', 'ওঠো জওয়ান দেশ কি', 'ধরতি কি শান', 'অনেকতা মে একতা'-ছ'টি গান পরিবেশন করেন ছ'টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। বঙ্গভাষায় গীত গানগুলি হলো,— 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে', 'রামধনু রঙে আজ', 'ধন্যধান্য পুষ্প ভরা', 'বান এসেছে মরা গাঙে' ও 'বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে।' একটি তামিল গানও পরিবেশিত হয়— 'ওডি ভিলাইয়ারে পাপ্পা'। গানের আসরে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সুরঞ্জনা চৌধুরী ও অমিত ঘোষ, এছাড়াও বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ধ্রুপদ সঙ্গীত শিল্পী মুক্তি চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সরস্বতী বন্দনা করেন কেশব মোদী। পরিবেশিত হয় বন্দেমাতরম্। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন তপন ঘোষ।

সংস্কার ভারতীর প্রযোজনায় গত ২৭ আগষ্ট মিনার্ভা থিয়েটারে আয়োজিত কবিগুরুর বিচিত্র কমেডি নাটক 'শেষরক্ষা'র একটি দৃশ্যে গৌতম ঘোষ ও অন্তিকা চট্টোপাধ্যায়। নাটকটির নির্দেশক বিকাশ ভট্টাচার্য। এর প্রথম অভিনয় ২৪ আগষ্ট, সুকান্ত সদনে।

প্রশ্ন একটাই : প্রধান শত্রু কে?

বিশাখা বিশ্বাস

ইন্দিরা গান্ধী বামবাদীদের সাহায্যে জরুরী অবস্থা জারী করে পুঁজির পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে জনগণের গণকণ্ঠকে থেঁতলে দেবার লক্ষ্যে অটল-আদবানী-রাজনারায়ণ-মিনু মাসানী-পিলু মোদী এবং এমনকি স্বদলীয় বিজয় সিং নাহারের সাথে বুর্জোয়া বরুণ সেনগুপ্ত প্রমুখকে জেলে পুরলেও যাদের এবং যাদের মার্ক্সবাদী মুখপত্র গণশক্তি-কালান্তরকে গাত্রস্পর্শ পর্যন্ত করেনি— কংগ্রেসের চিরকেলে বিশ্বস্ত সেবাদাস সেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টদের পলপট আর চেসেস্কুরা মমতা ব্যানার্জীকে আজ কেউ বলছেন ''ভয়ঙ্কর, বীভৎস, কুৎসিত, হিংস্র এবং মিথ্যাবাদী বিষাক্ত পার্টি-নেত্রী'', আবার অন্য কেউ বলছেন 'গণতন্ত্রের শত্রু' (বুদ্ধ এবং বিমান)।

জার্মানীর হিটলার তার গেস্টাপো বাহিনী দিয়ে তার নিজের পার্টিকে রক্ষা করতে পারেননি। রোমানিয়ার চেসেস্কু তার পার্সোনাল পুলিশ দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হননি। কাম্পুচিয়ার পলপট তার খুনে বাহিনী দিয়েও তার সরকারের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারেননি। পাঁচ লক্ষেরও বেশি সাধারণ প্রতিবাদী মানুষকে সাইবেরিয়ার মাটিতে পুঁতে ফেলেও রাশিয়ার কমরেড স্ট্যালিন ইতিহাসকে গোপন করতে পারেননি। কিন্তু স্কচ-হুইস্কি রাশিয়ার ভদকার সাথে ইতালীয় টাসকিন ফ্রান্সীয় শ্যাম্পেন মিশিয়ে বাংলার আলু আর সবজির উর্বরা ভূমিকে বিনাশ করে যারা করতে চেয়েছিলেন গাড়ী নামক শিল্প-কারখানা, অন্ধত্বের অনাচারে ভণ্ডামির অগ্নিস্ফুলিঙ্গে অশিক্ষার অন্ধকারে চাপাপড়া বিবেক দিয়ে তারাই সিঙ্গুরের কিশোরী তাপসী মালিককে ধর্ষণ ও খুন করার পর তারই বাপের কাঁধে ধর্ষণের দায় চাপিয়েছিল। 'জননী ইটভাটা' থেকে দশজন পোষা হার্মাদদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল— তবু ইতিহাসের মার থেকে সুহৃদ দত্ত আর দেবু মালিককে রক্ষা করতে পারেনি গঙ্গাতীরের হিটলার-চেসেস্কু এবং পলপট-স্ট্যালিনদের ভাড়াটে হার্মাদ আর তাদের রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনী। সেদিনের সেই লজ্জার লাশ আমরা কোথায় লুকিয়েছিলাম সিপিআই (এম)?

হিটলার তার জাতীয় সমাজবাদ শব্দবন্ধকে ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছিলেন ফ্যাসীবাদী কালকোর্তা বাহিনী। স্বদেশেও ইন্দিরা গান্ধী বামবাদীদের সাহায্যে জরুরী অবস্থা জারী করে পুঁজির পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে জনগণের গণকণ্ঠকে থেঁতলে দেবার লক্ষ্যে অটল-আদবানী-রাজনারায়ণ-মিনু মাসানী-পিলু মোদী এবং এমনকি স্বদলীয় বিজয় সিং নাহারের সাথে বুর্জোয়া বরুণ সেনগুপ্ত প্রমুখকে জেলে পুরলেও যাদের এবং যাদের মার্ক্সবাদী মুখপত্র গণশক্তি-কালান্তরকে গাত্রস্পর্শ পর্যন্ত করেনি— কংগ্রেসের চিরকেলে বিশ্বস্ত সেবাদাস সেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টদের পলপট আর চেসেস্কুরা মমতা ব্যানার্জীকে আজ কেউ বলছেন ''ভয়ঙ্কর, বীভৎস, কুৎসিত, হিংস্র এবং মিথ্যাবাদী বিষাক্ত পার্টি-নেত্রী'', আবার অন্য কেউ বলছেন 'গণতন্ত্রের শত্রু' (বুদ্ধ এবং বিমান)।

একথা অবশ্যই সত্যি, মমতার মুসলিম প্রীতিতে শঙ্কিত-অবসন্ন ক্লান্ত-রিক্ত দেশবিভাগের বলি শতসহস্র ভুক্তভোগী মানুষ। একথা মিথ্যা নয় যে সেই মুসলিম সমাজ মুর্শিদাবাদ তথা 'মুসলিমাবাদ'-কে বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছেন জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সাম্প্রতিক ইতিহাসের ধারায় এবং এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দই নীরব। একথাও সত্য যে, বে-আইনী অস্ত্রের ব্যবহারে তৃণমূল খুব বেশী পিছিয়ে নেই এবং শৃঙ্খলা-বিহীন কাণ্ডকারখানায় তারাও খুব বেশি ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

কিন্তু, মিথ্যার পর মিথ্যার রেকর্ড ভেঙে যে মুখ্যমন্ত্রী মাও-মমতা আঁতাতের গল্প ফেঁদে মমতাকে 'বিষাক্ত এবং ভয়ঙ্কর' বলেন সেই মিথ্যাচারী সুবিধাবাদী মুখ্যমন্ত্রীই কীভাবে চেপে যান কিষেনজীর সেই পৌনপুনিক কথিত উক্তি ''কেশপুর দখলের জন্যে আলিমুদ্দিন আমাদের পাঁচ হাজার গুলিগোলা দিয়েছিল '' (বিরোধীদের নিকেশের জন্যে সরকার থেকেও গোলাগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে বলে মমতা ব্যানার্জীর সেদিনের বক্তব্য স্মর্তব্য)। প্রশ্ন জাগে না, সেইসব দিনের মাওবাদী-মার্ক্সবাদী কর্মীবদলের ভয়ঙ্করতার চেয়েও কী বীভৎস আজকের এই তথাকথিত মাও-মমতা আঁতাত?

বাঘের সাথে লড়াই করে সাপের পেটে জীবন দিয়ে দণ্ডকারণ্য-ফেরৎ উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনে হোগলাপাতা এবং শনের দড়ি দিয়ে ঘর বেঁধেছিল। সেদিন ভরদুপুরেই নেমে এলো ভরারাতের অন্ধকার। সভ্যতার সেই ঘনান্ধকারে পুলিশ, পুলিশের ছদ্মবেশী হার্মাদ এবং দলীয় ক্যাডার দিয়ে চারদিক ঘিরে সেই সব ছিন্নমূল হতদরিদ্র বাঙালী উদ্বাস্তু, যারা আপন খরচায় বাংলায় থাকার কথা বলেছিল তাদের শতশত নৌকায় পুরে অন্যত্র পাঠাবার অছিলায় মাঝ নদীতেই ডুবিয়ে দেওয়া হলো বাংলারই বুকে (অভূতপূর্ব অঘোষিত যুদ্ধ/মরিচঝাঁপি /ছিন্নদেশ ছিন্ন ইতিহাস দ্রঃ)। সেদিন যে মুখ্যমন্ত্রী দম্ভভরে বলেছিলেন, ''কে ওদের ওখানে আসতে বলেছিল''— শুনতে বড় সাধ হয়, মমতা ব্যানার্জীর দল কী তাদের চেয়েও, তাদের সেই বীভৎসতার চেহারার চেয়েও আরও কুৎসিত, আরও ভয়ঙ্কর?

যারা তেত্রিশটি বছর নিহত পুত্রদের রক্ত বিধবা মায়ের মুখে মাখিয়ে দিয়ে দিবা তদবধি মন্ত্রীত্ব-সাংসদগিরি করে চলেছেন, যারা বিজন সেতুর ওপর প্রকাশ্যে ঊনিশজন সাধু-সন্ন্যাসিনীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেও 'বিবেক' ও বীভৎসার মধ্যে ফারাকের কথা বলে চলেছেন, নানুরে এবং মুলুকে মানুষ মেরে আজো যারা মোকদ্দমার দিন পাল্টে পাল্টে চলেছেন, যারা সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রামে খুন-ধর্ষণ- মানব হত্যা করার পরও প্রমাণলুপ্তির ব্যবস্থা করেও আদালতে পার পাবার চেষ্টা করে চলেছেন, জঙ্গলমহলে অরণ্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে বহুজাতিকের পায়ে সমর্পণের লক্ষ্যে যারা কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাশে রেখে চলেছেন, যাদের হার্মাদ নামক পোষা জীবেরা জঙ্গলমহল থেকে উঠে এসে হুগলী-পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় এলাকার পর এলাকা দখল করছে এবং সর্বোপরি জঙ্গলমহল এবং হুগলী-পুরুলিয়ার হার্মাদবাহিনীকে কার্যকরী উৎসাহ জোগাতে যে দলের দীপক সরকারেরা প্রকাশ্যে বলছেন ''এবারে তৃণমূলকে দেখে নেবার পালা, ইটের বদলে এবার তার পাটকেল খাবার দিন''— জানার খুবই ইচ্ছে তারাও কী তৃণমূলের চেয়ে আরও বেশি কুৎসিত, বীভৎস, ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র নয়?

আর গণতন্ত্র! সিপিআইএম পরিচালিত সরকার মাওবাদী গেরিলাতন্ত্রের মোকাবিলায় পুলিশ ও কেন্দ্রিয় বাহিনীর আশ্রয়ে হার্মাদদের দিয়ে হামলা চালাচ্ছে এবং ক্রমান্বয় প্রচারে তাকে বৈধতা দিচ্ছে। দীর্ঘদিনের উপেক্ষা-সামাজিক বঞ্চনা, প্রশাসনিক অত্যাচার, অর্থনৈতিক প্রবঞ্চনা, শোষণ নির্ভর শাসন এবং খুন-ধর্ষণ-উৎখাত হতে উদ্ভূত সমস্যা থেকে রাজনৈতিক নাফা তুলতে চাইছে মাওবাদীরা। রাজ্য প্রশাসনের পুলিশ যৌথবাহিনীতে থাকা কেন্দ্রিয় বাহিনীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে হার্মাদদের দিয়েই লালগড় এবং জঙ্গলমহলকে দখল করাতে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার, যে সরকারের সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক শক্তিশালী কণ্ঠ হিসেবে স্বয়ং বুদ্ধই বলছেন ''তৃণমূল এক উচ্ছৃঙ্খল মিথ্যাবাদী দল— এই দলকে ঠেকাতে যা আমি করছি তা আমি চিরকাল করে যাবো''। ঠিক এমন সময়েই মমতা ব্যানার্জী লালগড়ে বলেছিলেন ''কেন্দ্র এবং রাজ্য যৌথবাহিনীতে আলোচনার দ্বারা মাও-সমস্যা মেটান, প্রয়োজনে আমিও সেই দলে রইবো।'' গঙ্গাতীরের গণতন্ত্রের ভগীরথগণের কাছে জিজ্ঞাসা তাই, গণতন্ত্রের পথ কোনটি— মমতার প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া, নাকি মাও-মমতা এক হ্যায় বলে প্রচারকে অব্যাহত রেখে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রিয় বাহিনীর সাহায্যে হার্মাদদেরকে খুন-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগের অধিকার দিয়ে মাওপন্থীদেরকেই অধিকতর সশস্ত্র বিরোধিতার যথার্থ আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকেই পাকাপোক্ত করা— কোনটি?

সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা তাই : এ রাজ্যে এখন গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু কে? রাজনীতি, ভাবাবেগ এবং পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে উঠে তাই জিজ্ঞাসা একটাই : তেত্রিশ বছরের জানাচেনা কায়েমী কুশাসক খুনে-ধর্ষণ, অত্যাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত, মিথ্যাবাদী-প্রমাণ লোপকারী শাসকদল সিপিআইএম, নাকি অত্যাচারিত অবদমিত অনাগত অপরীক্ষিত মমতা ব্যানার্জীর দল— এ রাজ্যে গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু কে?

'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি'

(৯ পাতার পর)

যারা শেষ অবধি এক এবং অভিন্ন ক্ষেত্রে লীন হয়ে থাকে। সত্ত্ব-রজ-তম-লীন হয়ে থাকা চৈতন্যের মতো, এক সাম্যাবস্থা। এই সাম্যাবস্থা কোনও ভাবে বিঘ্নিত হলেই নির্গুণব্রহ্ম-সগুণ ব্রহ্মে পরিণত হয় এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। অথচ অভিন্ন ক্ষেত্রে প্ল্যাংকে দৈর্ঘ্যের বস্তু সৃষ্টির মাধ্যমে। হিন্দু উপনিষদীয় এই বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়েছেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা। পরমাণু বোমার প্রস্তুতের দায়িত্বে থাকা জে ওপেনহাইমার তাই গীতা পড়েছেন। এদেশীয় প্রগতিশীল সেকুলাররা না পড়লেও পরমাণু বিস্ফোরণ পরীক্ষার সময় তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে একাদশ অধ্যায়ের শ্লোক —

''নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন
বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো''

ডঃ ওপেনহাইমারের সেই সময়কার সহযোগী এবং পরবর্তীকালে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া এক বিখ্যাত পদার্থবিদ-এর হিন্দু-দর্শন সম্পর্কে একটি অভিমতের কথা জানাই। এটি ধান ভানতে শিবের গীত নয়, সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগতিশীলদের কাণ্ডজ্ঞান ফেরানোর সহায়ক হবে।

এই পদার্থবিদ, রিচার্ড ফাইনম্যান এক সময় ত্রিনিদাদের পোর্ট অফ স্পেন-এ ছিলেন। একটি নিগ্রো ড্রাইভারকে নিয়ে ওখানকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ভারতীয়দের কলোনীতে যান। নিগ্রো ড্রাইভারটি ভারতীয়দের সম্পর্কে বলে, ওরা দরিদ্র এমনকী ওখানকার নিগ্রো অধিবাসীদের চেয়েও দরিদ্র কিন্তু ওদের জীবনচর্যার ধরণ খুব আকর্ষণীয়। একটা ভালো কিছু আছে আমরা অনুভব করি। এটা কেন আমরা ঠিক জানি না। ফাইনম্যান উত্তর দিয়েছিলেন "There is a long tradition behind life in India that come from a religion and philosophy that is thousands of years old. And although these people are not in India they still par those traditions about what's important in life–trying to build for the future and supporting their children in the effort–which have come down far centuries."

বিখ্যাত ই পি আর প্রহেলিকা কী করে দুটি ফোটন কণা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যতদূরেই যাক, পরস্পরের স্পিন বিন্যাস বুঝে সেইমতো আচরণ করে তাৎক্ষণিকভাবে তা বুদ্ধি এবং ব্যাখ্যার অগম্য। কিন্তু হিন্দু বেদান্ত দর্শন-ই এর ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ— স্বীকার করেছেন হাইজেনবার্গে শ্রোডিংগার প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদরা। উপনিষদে রয়েছে কণাদুটির মধ্যে বাহ্য কোনও যোগাযোগের প্রয়োজন নেই। কারণ উভয়েই এক বিশ্বব্যাপী মন এবং অখণ্ড চৈতন্যের (বিজ্ঞান স্বীকৃত Consciousness— প্রেক্ষাপটে সঞ্চারমান। গীতায় আছে 'ময়ি সর্বমিদমপ্রোতং— বিশ্ব আমাতে (চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মেতে) প্রোথিত আছে। হাইজেনবার্গ তাঁর Physics and Philosphy-তে এবং শ্রোডিংগার তাঁর My views of the world গ্রন্থে উপনিষদ প্রদত্ত সমাধানকে স্বীকার করেছেন। শ্রোডিংগার বলেছেন 'আপনাদের যে জীবন নিয়ে আজ আপনারা বেঁচে আছেন তা নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন নয়, তা এক অর্থে সমগ্র মহাবিশ্বের মহাজীবনের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

তাই হিন্দু পুরোহিত এক ব্যক্তিকে অনন্ত কাল ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করেন এই ভাবে...ওঁ তৎসত্ অদ্যৈতস্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্ধে শ্রী শ্বেতবরাহ কল্পে সপ্তমে বৈবস্বতে মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে কলি প্রথমচরণে জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে... মাসে...পক্ষে...তিথৌ...এই অনুভূতিতেই রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন ''আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া বুকের মধ্যে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া...

আমরা আমাদের সুদূর ধূসর অতীতের বহমান জীবনচর্যার ধারা থেকে ক্রমবিচ্যুতির ফলে বিরাটের সঙ্গে সংযুক্তিহীন বলে ভাবছি—কল্প কি, মন্বন্তর কি যুগবিভাগ কি, তা ভুলেই গেছি। এক এক কল্পে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়। আধুনিক জ্যোতির্পদার্থবিদ্যায় বলে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল ১৪০০ কোটি বছর আগে। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে এমন জ্যোতিষ্কের যার বয়স ১৮০০ কোটি বছর। আধুনিক বিজ্ঞান তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু হিন্দুতত্ত্বে ব্যাখ্যা আছে। ওই জ্যোতিষ্ক অন্যকল্পের অবশেষ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া অনুষ্ঠানে কল্পের কথা আছে না কি? সুতরাং প্রগতিশীলরা দয়া করে 'হিন্দু' শব্দ থাকলেই আক্রমণাত্মক হবেন না— একটু ভাবুন। বিদেশী পণ্ডিতরা ভাবছেন আপনারা ভাববেন না?

Swastika
27 September - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

ভাষণরত রামেশ্বর কাবরা, (বসে) ধর্মচন্দ আগরওয়াল, রাধেশ্যাম গোয়েঙ্কা, মাঙ্গীলাল জৈন ও সজ্জন ভজনকা।

বনবন্ধু পরিষদের বার্ষিক উৎসবের আহ্বান

সমাজসেবায় দান করলে সম্পত্তি বাড়ে

বাসুদেব পাল।। ''দেশ ও সমাজের জন্য সৎপথে স্বোপার্জিত আয়ের সাত-আট শতাংশ সম্প্রদান করলে দাতার আয় বৃদ্ধি হয়। আমরা আগে ভারতীয় ছিলাম, আজকাল 'ইণ্ডিয়ান' হয়ে গেছি। দেশের বিশাল বনবাসী সমাজকে সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। এজন্য সবার আগে দেশ, তারপর সমাজ ও পরিবার এবং সবশেষে ব্যক্তি।'' এভাবেই বনবন্ধু পরিষদের একুশতম বাৎসরিক উৎসবে গত ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতার বালিগঞ্জে জি ডি বিড়লা সভাগারে হলভর্তি শ্রোতৃবৃন্দের সামনে বনবন্ধু পরিষদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বনবাসী সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাবলম্বনের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে সমাজের ঋণ পরিশোধের আহ্বান জানালেন বার্ষিক উৎসবের প্রধান বক্তা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিল্পপতি, মুম্বাই থেকে আগত রামেশ্বরলাল কাবরা।

শ্রী কাবরার বক্তব্যকে উপস্থিত হলভর্তি শ্রোতৃবৃন্দ তুমুল করতালিতে স্বাগত জানান।

মঞ্চস্থ অতিথিদের বিস্তৃত পরিচয় করিয়ে দেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সুভাষ মুরারকা। তিনি 'বনবন্ধু পরিষদে'র কলকাতা শাখার সংযোজক।

বনবন্ধু পরিষদের কাজের বিবরণ দেন কলকাতা শাখার সভাপতি ধর্মচন্দ আগরওয়াল।

তিনি জানান, বনবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে বর্তমান সারা ভারতে ৩৫,০০০ একল বিদ্যালয় চলছে। পূর্ণকালীন কার্যকর্তাদের সংখ্যা ৬২৫০ জন। এটাও পরিষদের এক বিশেষ প্রাপ্তি এবং উপলব্ধি।

ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দশ লক্ষ তিরিশ হাজার এবং সবাই বনবাসী। আগামী চারবছরের মধ্যে সর্বমোট এক লক্ষ গ্রামে একল বিদ্যালয় স্থাপিত হবে।

প্রসঙ্গত, এই অনুষ্ঠানে মা-বোনেদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত সমাজসেবী এবং 'ইমামী' শিল্পগোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার রাধেশ্যাম গোয়েঙ্কা। এছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সমাজসেবী শিল্পপতি এবং বনবন্ধু পরিষদের প্রধান সজ্জন ভজনকা এবং মাঙ্গীলাল জৈন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত শিল্পী (মুম্বাই) মনোজ যোশী এবং তাঁর গোষ্ঠীর অসাধারণ নাটক 'চাণক্য'। চাণক্য চরিত্রের সংলাপ ও অভিনয়ে মনোজ যোশী অতুলনীয়। এরকম একটি বর্ণমুখর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা কলকাতাবাসীকে বনবন্ধু পরিষদের উপহার। তবে এই অনুষ্ঠানে একল বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদেরও সামিল করলে ভালো হোত বলে শ্রোতাদের একাংশ মনে করছেন।

জি ডি বিড়লা সভাগৃহে শ্রোতাদের একাংশ।

ঐতিহ্যকে ধরে রেখেও নতুন সাজে

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা - ১৪১৭

বিস্ময়ের বাঙ্ময়

উপন্যাস

- নবকুমার বসু • সুমিত্রা ঘোষ • দীপঙ্কর দাস
- বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প

- গোপালকৃষ্ণ রায় • এষা দে • জিষ্ণু বসু • রমানাথ রায়
- শেখর বসু • সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত • বাদল ঘোষ
- গোপাল চক্রবর্তী

রম্য রচনা

- চণ্ডী লাহিড়ী

ছড়াকাহিনী

- পতিতপাবন গৌরসুন্দর : শিবাশিস দত্ত

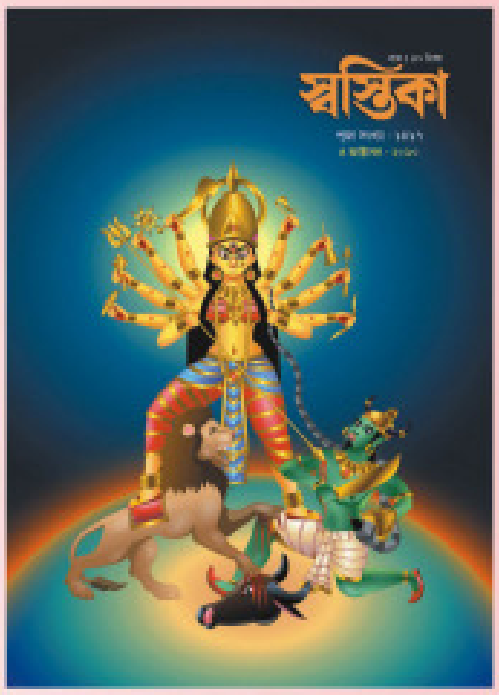

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।
মূল্য ৪০ টাকা।

প্রবন্ধ

- মহাশক্তি মা দুর্গা • স্বামী বেদানন্দ
- হিন্দুত্ব ও ভারতীয় যুবসমাজ • দত্তাত্রেয় হোসবালে
- ভারতের পরমাণু প্রযুক্তির স্থপতি ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা • দেবীপ্রসাদ রায়
- ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রতিমূর্তি : জীবনে ও মননে রমেশচন্দ্র দত্ত • প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়
- অনার কিলিং : মুসলিম দেশে দেশে • রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
- সেকুলারবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুত্ববাদী বলবে না তো! • দীনেশ চন্দ্র সিংহ
- আলোকোদ্ভাসিত তারাশঙ্কর - তাঁর কথাসাহিত্যে ভারত চেতনা • অচিন্ত্য বিশ্বাস
- হরপ্পীয় থেকে ব্রাহ্মী : লিপির বিবর্তন • সুমিত চক্রবর্তী
- উষাকাল থেকে উনিশ শতক : বাংলার ভ্রমণ কথা • অরিন্দম মুখোপাধ্যায়
- চিলেকোঠায় বঙ্গজীবন ও বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ • অর্ণব নাগ
- গৌড়ীয় নৃত্য • কাবেরী পুইতুণ্ডি কর
- সাধনা ও সাধকের আলোকে রবীন্দ্রনাথ • অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গান • সন্দীপ কুমার দাঁ
- আম আদমীর দেবতা • বিজয় আঢ্য

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম এর ...... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ : সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com